ল্যাম্পোস্টের বেলুন

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ

বৈশাখ ১৩৬৮

প্রকাশিকা

শুক্লা দে

শ্রী প্রকাশ ভবন

এ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

মুদ্রাকর

ধনঞ্জয় সামন্ত

মহেন্দ্র প্রেস

৫৮, কৈলাস বোস স্ট্রীট

কলকাতা-৬

শ্রী বিমান সিংহ

প্রীতিভাজনেষু—

এই লেখকের :

কাল ছিলো ডাল খালি

সোনার দুয়ার

কালো বনের শাদা ঘোড়া

সোনালি মাছ

১

কোনো-এক সময়ে কলকাতায় থাকতো ছোট্ট একটি ছেলে, যার নাম ছিলো রঙ্গন। কোনো ভাই-বোন ছিলো না তার। মস্ত বাসাটায় সারাক্ষণই একলা থাকতে হ'তো ব'লে বড্ড তার মন-খারাপ ক'রে বসতো মাঝে-মাঝে, একা থাকতে কিছুতেই ভালো লাগতো না। একবার আয়ার সঙ্গে গিয়েছিলো পার্কে বেড়াতে; গিয়ে ছাখে কালো কুচকুচে এক তুলতুলে বেড়ালছানা একা-একা চাপা গলায় টেনে-টেনে ডেকে বেড়াচ্ছে, ঠিক তারই মতো মন-খারাপ ক'রে আছে যেন সেই বেচারা। এই দেখে সে আর দেরি করলে না, আস্তে নরম ক'রে চাপা গলায় সে ডাক দিলে বেড়ালছানাটিকে, অমনি বাচ্চা বেড়ালটি তার চকচকে চোখ তুলে তার দিকে তাকালো একবার, তারপর গুটিগুটি এগিয়ে এলো তার কাছে; প্রথমে বেড়ালের সেই রেশমি রোঁয়ায় ঢাকা নরম ঘাড়ে হাত বুলিয়ে সে আদর করলো কিছুক্ষণ, তারপর আয়াটির প্রচণ্ড নিষেধ সত্ত্বেও কোলে ক'রে তাকে নিয়ে এলো বাড়িতে। আরেকবারও ঠিক এমনি হয়েছিলো; বাচ্চা একটি সোনালি রঙের পথের কুকুর ধ'রে নিয়ে এসেছিলো রাস্তা থেকে: 'ভারি সুন্দর কুকুরটি, না মা-মনি,' বাড়ি ফিরে মা-কে সে বলেছিলো, 'ছাখো, কী-রকম মখমলের মতো নরম ওর শরীর! জানো মা, বেচারা একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলো রাস্তায়—নির্ঘাৎ মাথা গোঁজার মতো কোনো জায়গা নেই ওর। তা,

আমি করলাম কি, সঙ্গে নিয়ে এলাম। আমাদের বাড়িটা তো ম-স্তো, অনেক জায়গা আছে, ও তো এখানে অনায়াসেই থাকতে পারবে। ও এখানে থাকলোই না-হয়, তাহ'লে আমিও বেশ একজন বন্ধু পাবো। ভালো হবে তাহ'লে, না মা ?' কিন্তু রঙ্গনের মা-মনি ভাবলেন বেড়াল-কুকুর তো এমনিতেই ভারি নোংরা জীব, তা ছাড়া বেড়াল থেকে হয় ডিপথেরিয়া, আর কুকুর যদি কখনো পাগল হ'য়ে গিয়ে পা চেটে দেয় তো নির্ঘাৎ জলাতঙ্ক। সুতরাং, 'না, রঙ্গু, এ-সব চলবে না কিছুতেই,' স্পষ্টই ব'লে দিলেন তিনি, আর মা-মনির সাজানো-গোছানো চকচকে ঘরের ভিতরে আবার রঙ্গন একলা হ'য়ে পড়লো, আগের চেয়েও আরো-বেশি একলা ; আগে তো তবু ভাবতে পারতো যে একলা আছি বটে, কিন্তু মনের মতো কোনো বন্ধু পেলেই আর তা থাকতে হবে না ; কিন্তু যাদের সে নিয়ে এলো বন্ধু হিশেবে, তাদের যখন তাড়িয়ে দেয়া হ'লো, তখন সে বুঝে নিলো যে, এমনি একলাই তাকে থাকতে হবে চিরকাল—তা ছাড়া ঐ 'মিষ্টি মিনি' আর 'দুষ্টু বাঘা'র সঙ্গে এর মধ্যেই তার বেশ ভাব হ'য়ে গিয়েছিলো। তাই এবার তার মন-খারাপ হ'লো আগের চেয়েও বেশি, কিন্তু কী আর করা, সব কিছুই একদিন মেনে নিতে হয়।

তারপর একদিন হ'লো কি, সকাল বেলায় ইশকুলে যাবার সময় রাস্তার মোড়ে ছাখে কি, লম্বা ল্যাম্পোস্টের মাথায় সুন্দর এক মস্ত পেট-মোটা লাল বেলুন সুতো দিয়ে বাঁধা রয়েছে। হঠাৎ সকালবেলায় ঘুম-চোখে রাস্তায় নেমে বেলুনটিকে দেখেই তো তার চোখের সব ঘুম ছুটে গেলো, গোল-গোল চোখে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে সে গালে হাত দিয়ে বেলুনটির দিকে তাকিয়ে রইলো। দস্তুরমতো রহস্যময় এই ব্যাপারটা—হঠাৎ আস্ত-এক পেট-ফোলা বেলুন এখানে

এলো কী ক'রে? কাল তো দেখিনি, সন্ধেবেলায় যখন বেড়িয়ে বাড়ি ফিরলাম।

এমন সময় আলতোভাবে হাওয়া এলো এলোমেলো—অনেক দূরের হাওয়া, দক্ষিণ দেশের হাওয়া, ঝাপশা গন্ধ-লাগা হাওয়া—আর সেই হাওয়ায় বেলুনটা এদিক-ওদিক বেশ অস্থিরভাবে উড়লো, কিন্তু কিছুতেই পারলো না সেই শক্ত সুতোর বাঁধন এড়িয়ে যেতে। একটু পরেই রঙ্গনের মনে হ'লো ওই লোভনীয় লাল বেলুনটা যেন তাকে নানাভাবে কাকুতি-মিনতি অনুনয়-বিনয় ক'রে ডাকছে।

তখুনি রঙ্গন মন ঠিক ক'রে নিলে। প্রথমে রাখলো তার বইখাতা ভরা ব্যাগটা ল্যাম্পোস্টের তলায়, অ্যাসফল্টের রাস্তার উপর, তারপর সোজা বেয়ে উঠলো একেবারে ডগায়, কোনো রকমে বেবুনের মতো পা দিয়ে ল্যাম্পোস্ট আঁকড়ে দু-হাত দিয়ে চটপট খুলে নিলো সুতোর বাঁধন, তারপর অঙ্কের সেই বাঁদরের মতো—যে কেবল একটা চকচকে তেল-মাখা বাঁশ বেয়ে খানিকটা ওঠে, আর অনেকটা নেমে আসে, আর অঙ্কের পিরিয়ডে রঙ্গনকে তার ওঠা-নামার হিশেব রাখতে দিয়ে একেবারে জের-বার ক'রে দেয়—নেমে এলো পরক্ষণে; নেমে, কাঁধে বই-খাতার ব্যাগটা ঝুলিয়ে দিয়ে, বাঁ-হাতে বেলুনের সুতো আঁকড়ে সোজা ছুটলো বাস-স্টপের দিকে। এতক্ষণ তো তার মনেই ছিলো না—এই রে, হ'লো বুঝি ইশকুলে দেরি হ'য়ে!

কিন্তু বাসের কণ্ডাক্টরটি আরেক মূর্তিমান। আইন-কানুন ছাড়া সে যেন পৃথিবীর আর-কিছুই জানে না। রঙ্গনকে দেখেই সে চটপট পক্ষের মতো আউড়ে গেলো, 'কোনো কুকুর কিংবা মস্ত মাপের পার্সেল, আর গ্যাস দিয়ে ফোলানো বেলুন—এই তিন জিনিশকে কিছুতেই বাসে তুলতে দেয়া হবে না।'

ল্যাম্পোস্টের বেলুন

'কেন? কেন?' ছুটে আসতে হয়েছে ব'লে রঙ্গন তখনো হাঁপাচ্ছে, কিন্তু তবু এই কথা শুনে অবাক হ'য়ে জিগেস না-ক'রে পারলো না।

'কেন, তা জানি না, কিন্তু এই হ'লো গিয়ে আইন।' কণ্ডাক্টর উদাস চোখে দূরের দিকে তাকিয়ে কথা বললো। যেন সামনে কেউ আছে, তা সে জানেই না; সে যেন এখন পরীক্ষার পড়া আউড়ে নিচ্ছে আপন মনে; যাদের চোখে দেখা যায় না, সে যেন দূরে দেখতে পাচ্ছে তাদেরকেই, তার তাই আইন না শুনিয়ে সে যায় কোথায়? 'যাদের সঙ্গে কুকুর থাকবে, তারা হেঁটে যাবে; যাদের সঙ্গে ভারিক্কি সব মালপত্র থাকবে, তারা যাবে ট্যাক্সিতে; আর যাদের সঙ্গে থাকবে হাওয়া-ভরা বেলুন, তারা যদি বাসে উঠতে চায় তো বেলুনের সুতো আলগা ক'রে "যাঃ" ব'লে আকাশে উড়িয়ে দেয় যদি, তবেই বাস তাদের নিয়ে যাবে।'

'কেন?' রঙ্গন জিগেস ক'রেই জিভে কামড় দিলে—বুঝতে পারলো এক্ষুনি তাকে আরেকপ্রস্থ আইনের কথা শোনানো হবে। হ'লোও কিন্তু তাই। তেমনি উদাসভাবে আস্তে দূরের দিকে কথাগুলিকে বুদ্বুদের মতো উড়িয়ে দিলো কণ্ডাক্টর, 'কেন, তা ভগবান জানেন; কিন্তু এই হ'লো গিয়ে আইন। আর আইন মেনে চলাই হ'লো প্রত্যেক নাগরিকের সব চেয়ে বড়ো কাজ।'

এদিকে বক্তৃতা কিংবা জ্ঞানের বুলি আবার রঙ্গনের খুব অপছন্দ। পাছে কণ্ডাক্টর আরো-কিছু বলতে শুরু ক'রে দেয়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি সে ব'লে উঠলো, 'ওঃ, তাই নাকি? জানতুম না তো!' কিন্তু এটাও রঙ্গনের ভুল হ'লো। কেননা তক্ষুনি কণ্ডাক্টর আবার দম-দেয়া পুতুলের মতো ব'লে উঠলো, 'কী রকম ইশকুলে পড়ো তুমি, যে এখনো

আইন শেখোনি? প্রত্যেক নাগরিকের প্রথম কর্তব্য হ'লো আইন-কানুন সব জেনে নেয়া, আর প্রধান কর্তব্য হ'লো আইন-কানুন সব মেনে চলা। কেমন ইশকুল তোমার, যে, কোনো আইন শেখায় না?'

এবার রঙ্গন আর ঐদিক দিয়েই গেলো না, বললো, 'যাক, আমি বাসে উঠতে চাই না—হেঁটেই যাবো আমি বেলুন হাতে নিয়ে।'

'তা এই ছোট্ট কথাটা আগে বলতে কী হয়েছিলো,' রঙ্গন বুঝতে পারলো না কণ্ডাক্টর কেন হঠাৎ এতটা রাগ ক'রে বসলো। 'যত্তো সব হ্যানোত্যানো।' ব'লে কণ্ডাক্টর রেগে তিনটে হ'য়ে এত জোরে ঘণ্টার দড়ি ধ'রে টান দিলে যে, দু'বার ঠুং-ঠুং আওয়াজ করিয়েই দড়িটা পট ক'রে ছিঁড়ে গেলো, কণ্ডাক্টর টাল সামলাতে না-পেরে পড়লো গিয়ে এক ধারে, আর রঙ্গন দেখলো অমনি হুস ক'রে বাসটা ঠিক বন্দুকের গুলির মতো ছুটে বেরিয়ে গেলো। তাকে না নিয়েই গেলো অবশ্য, কিন্তু সে তা নিয়ে মাথা ঘামালো না; অবাক হ'য়ে শুধু ভাবলো যে, ঘণ্টার দড়ি তো ছিঁড়ে গেলো, এখন কণ্ডাক্টর কী ক'রে বাস থামাবে? 'বাব্বা, ভাগ্যিশ অমন পাগল বাসে চাপি নি,' নিজেকে সে বোঝালো, 'তাহ'লে কোন মুলুকে না কোথায় গিয়ে যে বাস থামতো তার কি কোনো ঠিক ছিলো?'

কিন্তু মুশকিলের ব্যাপারটা হ'লো এই যে, ইশকুলটা আবার বেশ খানিকটা দূরে। কাজেই রঙ্গন যখন শেষকালে ইশকুলের দুয়ারে পৌঁছুলো, তখন সামনের দিকের মস্ত দরজাটা বন্ধ হ'য়ে গেছে—, অনেকক্ষণ হ'লো শুরু হ'য়ে গেছে ক্লাশ। তারপরেই তার মাথায় এলো এক বুদ্ধি। ইশকুলের চৌকিদার তখন ঝাঁট দিয়ে উঠোন পরিষ্কার করছিলো। রঙ্গন ঠিক করলে তার জিম্মাতেই বেলুনটা রেখে ক্লাশ করতে যাবে। করলোও তাই; অনেক ব'লে-ক'য়ে

চৌকিদারকে সে বেলুনের ভার নিতে রাজি করালো। সে তো প্রথমটায় রাজিই হয় না কিছুতে। 'আমি কি ছোট্ট ছেলে নাকি হাতে বেলুনের সুতো নিয়ে ঘুরে বেড়াবো? তাহ'লেই হয়েছে আর কি—কালকেই চাকরি থেকে একেবারে বরখাস্ত ক'রে দেবে।'

'রাখোই না তুমি; বুঝতে পারছো না, ক্লাশে বেলুন নিয়ে যাওয়া যায় না। তার উপর এমনিতেই অনেক দেরি ক'রে ফেলেছি।'

'তাহ'লে আনলে কেন বেলুন?'

'বারে, আমি কি আর বাড়ি থেকে এনেছি নাকি? ওকে তো পথে পেলাম—পথের বন্ধু ও,' রঙ্গন হাসলো একটু, 'কুড়িয়ে পেলাম যে ওকে।'

'যাকগে, এবারকার মতো অবশ্য রাখছি, কিন্তু এর পরে ফের যদি আবার কোনোদিন তোমার এই পথের বন্ধুকে নিয়ে আসো, তাহ'লে কিন্তু আমি ও-সব দায়িত্ব-টায়িত্ব রাখতে পারবো না, তা আগেই স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিচ্ছি।'

বুঝতেই তো পারছো, এইসব কথাবার্তায় রঙ্গনের আরো দেরি হ'য়ে গেলো। কিন্তু মাস্টারমশাই বললেন যে, যেহেতু এই প্রথম সে দেরি ক'রে এলো ইশকুলে, সেইজন্য এবার অবশ্য তাকে কোনো শাস্তি দেয়া হ'লো না, তবে ভবিষ্যতে যেন আর-কোনোদিন এত দেরি না করে। তাহ'লে কিন্তু সবগুলি পিরিয়ডেই তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে।

তা, কোনোমতে এক সময়ে তো সবগুলি ক্লাশ সাঙ্গ হ'লো কিন্তু শেষ ঘণ্টা থেকেই রঙ্গনের উশখুশানি বেশ বেড়ে গেলো, যখন সে জানলা দিয়ে দেখলো আকাশ ঘিরে মেঘ জমতে শুরু ক'রে দিয়েছে। আর, শেষ পর্যন্ত যে-ভয় করেছিলো, তা-ই হ'লো; যেই

ছুটির ঘণ্টা পড়লো ঢং-ঢং, অমনি সেই ঘণ্টার আওয়াজকে মেঘেরা ভাবলে কোনো সংকেত ব'লে, তারা তৎক্ষণাৎ টিপ-টিপ ক'রে বৃষ্টি ঝরাতে শুরু ক'রে দিলো, আর তাদের ইশারা-মতোই এলো ফুর্তিবাজ হাওয়া, শহরের অল্প কয়েকটি গাছের ডালেপালায় পাতা কাঁপিয়ে শোঁ ক'রে ব'য়ে গেলো বৃষ্টির ছাটকে একটু বাঁকিয়ে দিয়ে। আর চৌকিদার তো যেন ওৎ পেতে ছিলো। 'নাও, রঙ্গনবাবু, তোমার বেলুন ফিরিয়ে নাও—এখন তো তোমার ছুটি হ'য়ে গেলো।'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে রঙ্গন একবার বৃষ্টির দিকে তাকালো, আরেকবার চৌকিদারের মুখের দিকে। কিন্তু কিছুতেই আর সাহস ক'রে বলতে পারলে না আজকের দিনটা বেলুনটাকে তার জিম্মায় রাখবার জন্যে। এদিকে বাসের মধ্যে তো আর বেলুন নিয়ে ওঠা যাবে না, এই বিচ্ছিরি নিয়মটার জন্য তাকে কিনা হেঁটেই বাড়ি ফিরতে হবে। তা নিজের জন্য সে ভাবে না—বৃষ্টিতে ভিজতে তার ভালোই লাগে : চুল থেকে যখন সরু রেখা এঁকে স্রোতের মতো জলের ধারা নেমে আসে গালে-মুখে, তখন তার ভালোই লাগে। মা অবশ্যি বলবেন, 'তোমাকে না পই-পই ক'রে বারণ করেছি রঙ্গু, ককখনো বৃষ্টিতে ভিজবে না, তবু ফের বৃষ্টিতে ভিজেছো! এদিকে তো ঐ মিরকুট্টে চেহারা—বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়ে কোন দিন না তুমি এক কাণ্ড ক'রে বসো। জানো তো, ডাক্তারবাবু বলেছেন, তোমার শরীরের ধাতই অন্যরকম—একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে বসতে পারে।' তা পারে তো পারে, মায়ের ধমক খেয়েও বৃষ্টিতে ভিজতে তার কষ্ট হবে না, কিন্তু তার সুন্দর বেলুনটা কিনা বৃষ্টিতে ভিজে চুপশে যাবে এটা ভাবতেই তার খুব খারাপ লাগছিলো। কোনো কথা না-ব'লে চৌকিদারের কাছ থেকে বেলুনটা সে নিয়ে নিলে। তারপর এক ছুটে সোজা চ'লে এলো রাস্তায়।

মস্ত এক ছাতা মাথায় এক ভদ্রলোক তখন যাচ্ছিলেন ফুটপাথ দিয়ে। রঙ্গন গিয়ে সোজা তাঁর ছাতার তলায় ঢুকে পড়লো—নিজের গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়লো খানিকটা, অবশ্য বেলুনটাকে বাঁচাতে গিয়েই,—কারণ আসলে ছাতার তলায় সে নিজেকে না-ঢুকিয়ে বেলুনটাকেই ঢোকালো, এই বলা যায়। তারপর এমনিভাবে এ-ছাতা ও-ছাতা ক'রে শেষকালে সে যখন বাড়ি ফিরলো তখন অনেক সময় কেটে গেছে।

এদিকে বাড়িতে তো রঙ্গনের মা-মনি ভাবনায় একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়েছিলেন। হ'লো কী ছেলেটার? সেই কখন ইশকুল ছুটি হয়েছে, পাড়ার ছোট্টু আর জগু ফিরলো তো অনেকক্ষণ আগে, অথচ তার কিনা পাত্তাই নেই। গেলো কোথায় ছেলেটা? বৃষ্টিতে ভিজলেই হয়েছে আর-কি! এমনিতেই ছেলের শরীরের ধাত মোটেই কষ্ট সইবার মতো না—রোদে-বৃষ্টিতে চট ক'রেই অসুখ ক'রে বসে; এই সেদিনও ঠাণ্ডায় ফুশফুশে জল জ'মে যাবার জোগাড় ক'রে বসেছিলো! নাঃ, বড্ড দুরন্ত হয়েছে ছেলেটা, কখন যে কী ক'রে বসে, কিছুরই ঠিক নেই! আজ খুব ক'রে ধমকে দিতে হবে।

তিনি যখন এই সব কথা ভাবছেন, আর অস্থিরভাবে একবার জানলায়, একবার দরজায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, রঙ্গন তখন গুটিশুটি চুপিশাড়ে বাড়ি ঢুকলো। জামা-জুতো সব ভিজে একেবারে ঝোড়ো গাছ; ইচ্ছেটা, মা-মনি টের পাবার আগেই ধোয়া জামা-কাপড় প'রে নেয়। কিন্তু সুযোগ পেলে তো? দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন মা-মনি। ভিজে কাকের মতো ছেলেকে ফিরতে দেখেই ব'লে উঠলেন, 'আচ্ছা, এই ছেলেকে নিয়ে আমি কী করি। এই ব্যাং-

ডাকানি বৃষ্টির মধ্যে কিনা তুই ভিজে এলি! অসুখ হ'লে আর তোর কী—দিবি তো জ্ঞান হারিয়ে বিছানায় প'ড়ে থাকবি! যত জ্বালা হয়েছে কিনা আমার! কী ওটা তোর হাতে?'

ভয়ে-ভয়ে রঙ্গন বললে, 'এই বেলুনটা পেলাম কিনা মা-মনি। এদিকে বেলুন নিয়ে তো আর বাসে উঠতে দেয় না—তাই হেঁটে ফিরতে হ'লো। তা বেশি তো আর ভিজি নি, একটুখানি শুধু।'

'এই তোর একটুখানি হ'লো!' রঙ্গনের মনে হ'লো মা-মনি যেন আগুনের শিখার মতো জ্ব'লে উঠলেন। 'যত নষ্টের গোড়া এই বেলুনটা! দেরিরও কারণ হ'লো এটা, ভিজে-যাবার কারণও হ'লো এটা। দে আমাকে ওটা,' মা-মনি বেলুনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'ছাখো মা-মনি, কী সুন্দর লাল—একেবারে জ্বলজ্বল করছে।'

'নিকুচি করেছে তোর সুন্দর বেলুনের।' এই ব'লে রঙ্গনের হাত থেকে বেলুনটা কেড়ে নিয়ে তিনি জানলা খুললেন, তারপরে বেলুনটাকে বের ক'রে দিলেন ঘর থেকে।

এখন, আমরা তো সকলেই জানি যে গ্যাসের বেলুন হাত ফশকে গেলেই সোজা আকাশে উঠে হাওয়ায় ভেসে উড়ে চ'লে যায় দূরে, তারপরে একেবারে দিগন্ত পেরিয়ে চ'লে যায় কোনো দূরের দেশে, আর তাকে দেখাই যায় না চোখে। রঙ্গনও তা-ই জানে। বিজ্ঞানের ক্লাশে মাস্টারমশাই ওদের সাতদিন ধ'রে গ্যাসের ক্রিয়াকলাপ পড়িয়েছেন: 'হাইড্রোজেন গ্যাস তো হালকা, তা-ই কেউ যদি কোনো পাৎলা বেলুনের ভিতর কেবল হাইড্রোজেন গ্যাস পুরে দাও, তাহ'লে তা সাধারণ বাতাসের চেয়ে হালকা হ'য়ে যাবে ব'লে আকাশে উড়ে যাবে। এখন এই মজার জিনিশটা হঠাৎ

চোখে পড়েছিলো ফ্রান্সের দুই ভাইয়ের—সেই রাইট-ভায়েদের ছিলো বইয়ের দোকান,—' এই ব'লে তিনি সেই ফরাশি দেশের দুই মাথা-পাগলা ভাইয়ের খবর জানালেন সবাইকে, যারা প্রথম বেলুনে ক'রে আকাশে ওড়ার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু রঙ্গনের বেলুন করলে কি, কোনো আইনই মানলে না বিজ্ঞানের ; তাকে যেই জানলা দিয়ে বের ক'রে দেয়া হ'লো, তার তখন অমনি উড়ে চ'লে যাবার কথা : কিন্তু সে করলে কি, জানলার বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকলো চুপচাপ, আর হাওয়ায় এমনভাবে দুলে-দুলে উঠলো, যে, মনে হ'লো সে যদি পারতো তো মাথা নেড়ে বলতো, 'এ-সব আমি পছন্দ করি না—এ-সব আমি কিছুতেই পছন্দ করতে পারি না।'

রঙ্গন তাকিয়ে দেখলো, কাচের ভিতর দিয়ে বেলুনটা তার দিকে চেয়ে আছে। মা ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন রঙ্গনের জন্য শুকনো ইজের আর কামিজ আনতে ; সে তাড়াতাড়ি করলে কি, আস্তে জানলা খুললে খুব সাবধানি হাতে, যাতে একটুও শব্দ না-হয়, তারপরে বেলুনটাকে হাত বাড়িয়ে ধ'রে ঘরের মধ্যে এনে লুকিয়ে রাখলো, আর ফিশফিশ ক'রে বললো, 'সাবধান, এখানে লুকিয়ে থেকো কিন্তু—বেরিয়ে পোড়ো না যেন, খবরদার! মা-মনি দেখলেই, ব্যাশ, তোমাকে একেবারে অনেক দূরে চালান ক'রে দেবেন।'

বেলুন যেন তার দিকে তাকিয়ে দুষ্টুভাবে হেসে উঠলো। যদি মানুষ হ'তো তো নির্ঘাৎ চোখ টিপে বলতো, 'আর বলতে হবে না—ঠিক আমি বুঝে নিয়েছি কী করতে হবে না-হবে।'

২

পরদিন ইশকুলে যাবার আগে রঙ্গন এসে প্রথমে আস্তে জানলা খুলে দিলে। তারপরে বেলুনটার সুতো ধ'রে জানলার বাইরে ছেড়ে দিয়ে ফিশফিশ ক'রে বললে, 'আমি ডাক দিলেই তুমি নিচে চ'লে যেয়ো কিন্তু। যদি তোমাকে হাতে ক'রে নিয়ে যাই, তাহ'লে—বুঝতেই তো পারছো—কী ভীষণ রেগে যাবেন মা-মনি।'

আস্তে হাওয়া দিচ্ছে সকালবেলা, বেলুনটা একটু ন'ড়ে উঠলো। ভঙ্গিটা এমন যে দেখে মনে হয় সে যেন সায় দিচ্ছে রঙ্গনের প্রস্তাবে।

বইপত্তরের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে মা-মনিকে চুমু খেতে যেতেই মা-মনি তাকে ব'লে দিলেন, 'আজ যেন আবার দেরি না-হয়, সাবধান থেকো কিন্তু। শেষকালে যে এসে বলবে "একটা বেলুন ছিলো যে সঙ্গে," ও-সব কিন্তু চলবে না।'

'না মা-মনি, আজ আর দেরি হবে না,' এই ব'লে মা-মনির গলা জড়িয়ে চুমু খেয়ে রঙ্গন পাঁচ-তলা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। রাস্তায় নেমেই ফুর্তিবাজ গলায় চ্যাঁচামেচি ক'রে হাঁকডাক শুরু ক'রে দিলো সে, 'বেলুন! বলি, ওহে বেলুন, শিগগির নেমে এসো। এত দেরি করলে আমার যে ইশকুলের দেরি হ'য়ে যাবে!'

হাওয়ায় ভেসে ঘুরতে-ঘুরতে বেলুন তক্ষুনি নিচে নামতে শুরু ক'রে দিলে, তারপর রঙ্গনের কাছে এসে বার-কয়েক ঘুরপাক খেয়ে

ফুর্তিতে তার চারপাশ ঘুরে নিলো—ভাবখানায় আহ্লাদের সীমা নেই। এতক্ষণে একটু স্বাধীন হওয়া গেলো, আর এক্ষুনি কিনা ইশকুলে যেতে হবে? এ-কথা সে বললো না বটে, কিন্তু রঙ্গন যেন বেলুনের হাবভাব বুঝে নিতে পারলো। 'না, না, ইশকুল ফাঁকি দেয়া চলবে না। আর কতক্ষণই বা লাগবে? আজ তো শনিবার—ইশকুল তো চট ক'রেই ছুটি হ'য়ে যাবে।'

বেলুন এ-কথা শুনে তার ঘুরপাক-খাওয়া থামিয়ে দিলো, যেন বড্ড অভিমান হয়েছে। 'তুমি তো বেশ ইশকুলে চ'লে যাবে, এদিকে আমাকে যে একা থাকতে হবে, আমার বুঝি তাতে কষ্ট হয় না'—ভাব দেখে মনে হ'লো তার বক্তব্য যেন অনেকটা এই রকম। 'না, না, মন-খারাপ কোরো না, লক্ষ্মী তো! আমারও তো কষ্ট হবে একটু, কিন্তু তাই ব'লে ইশকুল কামাই করলে তো আর চলে না। রাগ কোরো না তুমি, এই তো—কেবল যাবো আর আসবো। চলো, এখন না-গেলে শেষকালে দেরি হ'য়ে যাবে।'

বেলুন তো স্থির হ'য়ে ছিলো একটুক্ষণ, রঙ্গনের কথা ফুরোবার আগেই আবার একটু হাওয়া এলো এলোমেলো, আর তারও নাচ শুরু হ'য়ে গেলো তৎক্ষণাৎ। রঙ্গন যখন বললে যে এবার না-গেলে দেরি হ'য়ে যাবে, তখন সে কাৎ হ'য়ে চিৎ হ'য়ে নানাভাবে নিজের কারদানি দেখিয়ে তাকে অনুসরণ ক'রে চলতে লাগলো—রঙ্গনকে সুতোটা পর্যন্ত ধরতে হ'লো না—ঠিক চললো সে সঙ্গে, যেমন যায় পোষমানা কুকুর তার প্রভুর সঙ্গে-সঙ্গে।

কিন্তু পোষা কুকুরেরাও যে সব সময়েই প্রভুর কথা শুনবে, তার তো কোনো মানে নেই—কখনো-শখনো তাদেরও তো দুষ্টুমি করার ইচ্ছে হয়। কাজেই মাঝে-মাঝে রঙ্গনের কথা অমান্য করার ইচ্ছে

বেলুনের তো অনায়াসেই হ'তে পারে। হ'লোও তাই। রাস্তা পেরোবার জন্য রঙ্গন যখন বেলুনটাকে ধরতে চাইলো—হাত ধ'রে নিয়ে যেতে হবে তো ওকে, না-হ'লে দোতলা বাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগুক আর কি!—বেলুন তথুনি মুচকি হাসির ভঙ্গি ক'রে চট ক'রে দূরে উড়ে গেলো। যেন খুব বাহাতুরি দেখানো হ'লো—এমনি তার ভাব। ককখনো একা রাস্তা রাস্তা পেরোই নি তো হয়েছে কি, এই তো পেরিয়ে গেলাম চট ক'রে। আসুক দেখি তোমার দোতলা বাস, দেখি আমার সুতোর ডগাটা পর্যন্ত ছুঁতে পারে কি না!

রঙ্গন তো এই সব দেখে এমন এক ভান করলো যেন তার এই সব বাহাতুরি তার চোখেই পড়ে নি। এমন এক ভঙ্গি ক'রে সে হেঁটে রাস্তা পেরোলো যে দেখে মনে হ'লো লাল বেলুন নামে কোনো পদার্থ যে পৃথিবীতে আছে তা যেন সে কস্মিনকালেও জানে না। তারপরে, রাস্তা পেরিয়েই, হনহন ক'রে হেঁটে গিয়ে তাড়াতাড়ি একটা দেয়ালের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো। লাল বেলুন তো এ-দিকে মোটেই খেয়াল করে নি রঙ্গন কোথায় যাচ্ছে—সে তো শূন্যে একের পর এক ডিগবাজি খেয়ে তখন সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছে—তাই হঠাৎ যখন সে দেখলো আশপাশে কোথাও রঙ্গন নেই তখন ভারি উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়লো। ছুটোছুটি শুরু ক'রে দিলো সে তৎক্ষণাৎ; তাকালো এদিক-ওদিক, বাঁকালো তার গোল হাওয়া-ভরা লাল শরীর, ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখলো পিছনে, কাৎ হ'য়ে সে দেখলো একপাশে—নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলো রঙ্গন কোথায় আছে তার খোঁজ নেবার।

শেষে হঠাৎ দূরে দেয়ালের আড়ালে রঙ্গনের কাঁধের বইয়ের ঝোলাটা তার চোখে পড়লো, অমনি ফুর্তিতে আর খুশিতে সে প্রায় আটখানা

হ'য়ে গেলো ; প্রথমে তো আবার সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো গোটা কয়েক ডিগবাজি খেয়ে নিলে পলকের মধ্যে, তারপর মাথা দোলাতে-দোলাতে তাড়াতাড়ি সে নেমে এলো রঞ্জনের হাতের কাছে ; পাৎলা হাওয়া দিয়ে ফোলানো নিজের শরীরটা নানাভাবে কাৎ ক'রে বাঁকিয়ে চিৎ ক'রে ক্ষমা চাইলে সে রঞ্জনের কাছে তার দুষ্টুমির জন্যে। যেন বলতে চাইলো, 'আর ককখনো এমন করবো না, লক্ষ্মী তো,—রাগ কোরো না তুমি ! রাগ করলে ? কথা বলছো না কেন ? শেষে আমার কান্না পেলে আমি যে চুপশে যাবো। লক্ষ্মী তো, কথা বলো একটা।'

রঞ্জন খুব গম্ভীরভাবে মায়ের মতো ভারিক্কি গলায় বললে, 'মনে থাকবে তো ? ফের যদি দেখি এমনিভাবে দুষ্টুমি করছো তাহ'লে তোমার সঙ্গে জীবনে আর একটাও কথা বলবো না—এই ব'লে রাখলাম।'

বেলুন ঠিক তার পায়ের কাছে নেমে এলো, যেন এক্ষুনি দণ্ডবৎ ক'রে ক'রে প্রতিজ্ঞা করবে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ রঞ্জন তাকে তুলে নিলো দু-হাত বাড়িয়ে। 'চলো, চলো বাস-স্টপে। আর দেরি না।'

বাস-স্টপে যেতে-যেতে রঞ্জন খুব ক'রে বোঝালো বেলুনকে, 'খুব সাবধানে আমার পিছন-পিছন এসো কিন্তু। তোমাকে হাতে নিয়ে তো আর আমাকে বাসে উঠতে দেবে না, তাই তুমি এক কাজ কোরো—চলন্ত বাসটার পিছন-পিছন চ'লে এসো। বাসটা যাতে ককখনো চোখের আড়াল না-হ'য়ে যায়, সেদিকে খেয়াল রেখো কিন্তু। একবার যদি চোখের আড়াল হয়, তাহ'লেই কিন্তু হারিয়ে যাবে—কিছুতেই আর পথ চিনে নিতে পারবে না। আর যা একখানা শহর—ভিড়, আর ভিড়—এত লোক যে, মানুষের মাথা যেন মানুষে খায়। এত লোকের মধ্য থেকে কি আর আমাকে তুমি বের ক'রে নিতে পারবে ! তা ছাড়া অনেক বাহাদুরি দেখিয়েছো তুমি এতক্ষণ—তুমি যে অন্যদের মতো নও, তুমি

যে আলাদা, অসাধারণ, বাহাত্বর—সব তো আমি মেনেই নিচ্ছি। কাজেই আর বাহাত্বরি দেখাবার চেষ্টা না ক'রে আমি যা বলি, তা-ই শোনো দেখি চুপ ক'রে। কী? যা বললাম, সব মনে থাকবে তো?'

বেলুন তার মাথা কাৎ ক'রে সমস্ত শরীরটা ঝাঁকালো। 'বলছি তো মনে থাকবে,' এই হ'লো তার ভঙ্গি।

ততক্ষণে তারা দু-জনে বাস-স্টপে পোঁছে গেছে। রঙ্গন যেই পা-দানিতে পা রেখেছে, অমনি কণ্ডাক্টর তাকে বাধা দিলে। 'উঁহু, কোনো হাওয়া-ভরা বেলুন নিয়ে ওঠা চলবে না।'

'আমি তো আর বেলুন নিয়ে উঠছিনা। ও তো বাসের বাইরেই আছে,' তৎক্ষণাৎ রঙ্গন উত্তর দিয়ে দিলো।

'তাই নাকি? এই তো বেশ লক্ষ্মী ছেলে,' ব'লে কণ্ডাক্টর তক্ষুনি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে ঠুং-ঠুং ক'রে।

তার পরেই সেই অবাক-করা দৃশ্যটা দেখা গেলো কলকাতার মস্ত, ব্যস্ত রাস্তার উপর। দৃশ্যটা কি? না, একটা পেট-মোটা লাল রঙের বেলুন কিনা একটা রাক্ষসের মতো প্রকাণ্ড দোতলা বাসের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা দিচ্ছে। রাক্ষুসে বাস না তো কী? কেমন সুন্দর পেটে পুরে নিলো রঙ্গনকে!

তা, এই মস্ত রাস্তায় নিজের ইচ্ছে-মতো ছুটোছুটি করার অধিকার পেলো দেখে বেলুনের ফুর্তি ছাখে কে। রীতিমতো শাপলা খেতে পড়লো যেন সে, চারদিকের বাস-ট্রাম গাড়ি-ঘোড়া লোকজনের ভিড়ের মধ্যে সে কিনা একলা ইচ্ছে-মতো ঘুরে বেড়াতে পারে। ইচ্ছে-মতো মানে আর কি? না, কেউ তার সুতো ধ'রে নেই, এই আর কি! এটা তো ঠিক একটা কাজ তাকে করতেই হবে—সেটা হ'লো সামনের ঐ বাঘ-মার্কা মস্ত লাল দোতলা বাসটার পিছু-পিছু যেতে হবে, যেখানে রঙ্গন যায়,

সেই পর্যন্ত। কিন্তু তবু একা যাচ্ছে সে, এটাই বা কোনো কম কথা নাকি? এর নাকের ডগার কাছে তিনবার ঘুরপাক খেয়ে, ওর মাথায় নিজের লাল শরীর ছুঁইয়ে, বাসের মাথায় চেপে ব'সে নানা রকম কারদানি দেখাতে-দেখাতে সে চললো। ঝকঝকে মস্ত গোল আগুনের চাকা গড়িয়ে উঠে এসেছে তখন আকাশের গায়ে, আর আকাশকে মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ দ্বিগুণ উঁচুতে উঠে গেছে—এত উজ্জ্বল এক দিন ধীরে-ধীরে নিজের আলোর পাপড়িগুলি জ্বেলে দিলে। আর সেই আলোয় টকটকে লাল রঙের পানের মতো দেখালো বেলুনকে—জ্বলজ্বলে লাল, যেন রঙিন একটি আভা সে ছড়িয়ে দিচ্ছে তার কাঁপা শরীর থেকে। যেন সে হঠাৎ লাল একটা চুপচাপ শাঁখের মতো হ'য়ে উঠেছে, আর সেই ব্যস্ত শহরের শোরগোলের ভিতর মাঝে-মাঝে নিজেকে বাজিয়ে দিচ্ছে শব্দহীন এক সুরে।

দোতলার জানলা থেকে কোনো রকমে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে রইলো রঞ্জন—মাঝে-মাঝে তার চোখে পড়ে বেলুনটিকে, কখনো-বা তার সুতোটুকুই শুধু—ঢেউয়ের মতো এঁকেবেঁকে কেঁপে-কেঁপে সুতোটা হাওয়ায় উড়ছে তারই সঙ্গে, কখনো আবার কিছুই চোখে পড়ে না। ইশকুলের পড়া তার মনে নেই একটুও, সব ভুলে গেছে তার বেলুনের কথা ভাবতে-ভাবতে—কারণ তার মনে তো আর লাল বেলুন ছাড়া আর-কোনো ভাবনা নেই। যখন বেলুনটিকে, কিংবা তার সুতোর ডগা, সে দেখতে পায় না, ভয়ে তার বুকটা ধ্বক ক'রে লাফিয়ে ওঠে—তবে কি আটকে গেলো কোথাও তার সুতো—কোনো ট্র্যামলাইনের তারে, কি গাছের ডালেপালায়? না কি কেউ হাত বাড়িয়ে ধ'রে নিলে তাকে? মুখটা তার কালো হ'য়ে শুকিয়ে যায়, চোখ দুটি চকচকে হ'য়ে ওঠে, আর পলক না-ফেলে সে কেবল তাকিয়ে থাকে পিছন দিকে।

তারপর যেই আবার বেলুনের ফুর্তিবাজ শরীরটুকু চোখে প'ড়ে যায়, অমনি স্বস্তির নিশ্বেস পড়ে বুক খালি ক'রে, সব ভার চ'লে যায় মুহূর্তে।

এইভাবে দুজনে ইশকুলের কাছে পৌঁছুলো। বইয়ের ঝোলা নিয়ে রাস্তায় নেমে হাত নেড়ে রঙ্গন ডাকলো তার বেলুনকে ; কিন্তু রঙ্গনকে নামতে দেখেই বেলুনের মাথায় আবার দুষ্টুমির মতলব চেপে গেছে : এতক্ষণ তো আর রঙ্গন তার কারদানি দেখতে পায়নি, কাজেই এবার তো তাকে নিজের চৌকশ খেলাগুলি দেখাতে হয়। চট ক'রে সে নেমে এলো রঙ্গনের হাতের কাছে, কিন্তু যেই রঙ্গন হাত বাড়িয়ে দিলো তাকে ধরবার জন্যে, অমনি সে তিনবার পাক খেয়ে শোঁ ক'রে উঠে গেলো উপরে। বার কয়েক এমনি চললো দুজনের মধ্যে—'কিন্তু আমাকে

ছুঁতে পারলে তো ধরা দেবো,' এই ভঙ্গিটা বেলুন কিছুতেই ছাড়লো না। কিছুতেই সে ধরা দিলে না রঙ্গনের হাতে। এদিকে তখন ঢং-ঢং ক'রে ঘণ্টা বেজে উঠেছে জোরে, ইশকুলের দারোয়ান ফটক বন্ধ ক'রে দেবার জন্য তোড়জোড় শুরু ক'রে দিয়েছে—এই সব খেয়াল ক'রে বেচারা রঙ্গনকে একাই ঢুকে যেতে হ'লো ভিতরে; যাবার আগে ব'লে গেলো, 'সাবধান কিন্তু, দেখো, খুব দূরে যেয়ো না যেন—শেষকালে হারিয়ে যাবে, আর আমি কিছুতেই তোমাকে খুঁজে পাবো না। আমার কিন্তু ভাবনার শেষ থাকবে না—সব সময়েই ভয় থাকবে! যা দুষ্টু হয়েছো তুমি, কখন যে কী কাণ্ড ক'রে বসো, তার তো কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। তা, এখন যখন আমার হাতে ধরা দিলে না, তখন থাকো একা বাইরে প'ড়ে—আমি ভিতরে গিয়ে ক্লাশ ক'রে আসছি।'

গেলো বটে সে ভিতরে, কিন্তু বেলুনকে বাইরে রেখে এসে তার চিন্তার সীমা থাকলো না।

৩

বেলুন যেই দেখলো যে রঙ্গন ভিতরে চ'লে যেতেই দারোয়ান মস্ত কালো লোহার ফটকটা বন্ধ ক'রে দিলে, তখন একটু ঘাবড়ে গেলো। এদিকে আবার এর মধ্যেই আরেক ফ্যাচাং জুটে গেলো। রাস্তায় কতগুলো ছেলে ইশকুল পালিয়ে ডাংগুলি খেলছিলো ; যেই তারা দেখলে যে বেওয়ারিশ এক বেলুন ইশকুলের ঠিক সামনেটায় হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, অমনি তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি ক'রে নিলো, বেলুনটিকে ধরতে হবে। যেমনি ভাবা, অমনি কাজ—একজন গিয়ে কোত্থেকে যেন চট ক'রে এক ঢ্যাঙামতো কঞ্চি নিয়ে এলো, তারপর ডগাটায় একটা আঁকশি বেঁধে সবাই ছুটে এলো বেলুনটার দিকে।

বেলুন তো প্রথমটায় তাদের রকমশকম দেখে দস্তুরমতো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো। আঁকশিতে তারা তার সুতোটা ঠিক জড়িয়েই ফেলতো যদি না এমন সময় গাছের পাতা কাঁপিয়ে জোরে হাওয়া আসতো দূর থেকে। হাওয়া আসতেই সুতোটা বাঁকাভাবে আরো উঁচুতে উঠে গেলো, আর বেলুনও হাওয়ার তোড়ে কেঁপে উঠেই খেয়াল ফিরে পেলো। চট ক'রে সে দেয়াল টপকে উড়ে চ'লে এলো ইশকুলের ভিতরে। ভাগ্যিশ অমন সময় মুশকিল আসানের মতো হাওয়া দিয়েছিলো জোরে, না-হ'লে আক্কেল সেলামি দিতে গিয়ে যে কী

হ'তো ভাবতে গিয়েও তার লাল শরীরটা কেবল শিউরে-শিউরে উঠলো।

রঙ্গনদের ক্লাশের ছেলেরা তখন সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ক্লাশঘরের সামনেই ছোট্ট একফালি সবুজ জমির উপর—প্রত্যেক শনিবারে প্রথম ঘণ্টায় তারা সেখানে দাঁড়িয়ে ড্রিল করে আর নানারকম শারীরিক কশরৎ শেখে। তালপাতার সেপাইয়ের মতো ঢ্যাঙা, রোগা এক মাস্টারমশাই তাদের ড্রিল শেখান—মস্ত এক মোটা গোঁফ আছে তাঁর ঠোঁটের উপর—বোঁচা নাকের তলায় কালো ঝোপের মতো; তারই আড়াল থেকে ভীষণ আওয়াজ ক'রে সব নির্দেশ বেরিয়ে আসে।

বেলুন ভিতরে ঢুকেই ভয়ানক এক তোপ-ফাটার আওয়াজ শুনলে, 'অ্যাটেনশন!' শুনেই তো সে কেঁপে গেলো. তাকিয়ে দেখলো ছেলেরা সবাই একসঙ্গে খুব আঁটোশাঁটোভাবে টান-টান হ'য়ে দাঁড়ালো। দু-তিনবার ও-রকম ভীষণ গর্জন হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ছেলেদের দাঁড়াবার কায়দা বদলে যাচ্ছে দেখে তার ভারি মজা লাগলো, তার উপর ছেলেদের ভিড়ের মধ্যে একদিকে সে ফুটফুটে রঞ্জনকে বের ক'রে নিয়েছে—কাজেই তারও তখন হঠাৎ শখ হ'লো এমনিভাবে ড্রিল করার। চট ক'রে উড়ে গিয়ে সারি-বাঁধা ছেলেদের পিছনে সে দাঁড়ালো শূন্যে।

ড্রিল স্যার অবশ্য প্রথমটায় তাঁর এই নতুন এবং অদ্ভুত ছাত্রটিকে খেয়াল করেন নি। কিন্তু একটু পরেই যেই তাঁর চোখে পড়লো যে যেমনি তিনি নির্দেশ দেন, অমনি ছেলেদের সঙ্গে-সঙ্গে লাল এক বেলুনও কাৎ হ'য়ে, খাড়া হ'য়ে, নুয়ে গিয়ে নানাভাবে ছেলেদের অঙ্গভঙ্গি নকল করার চেষ্টা করছে, অমনি তাঁর গোল-গোল ভাঁটার মতো চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো, আর বোঁচা সেই মস্ত ঝোপের মতো গোঁফটা মুখের দু-পাশে ঝুলে পড়লো; প্রথমটায় তো খানিকক্ষণ তিনি কোনো কথাই বলতে পারলেন না, কেবল হাঁ ক'রে বড়ো-বড়ো চোখে তাকিয়ে থাকলেন স্তব্ধভাবে, যেন সব নির্দেশ একসঙ্গে ঠেলাঠেলি ক'রে তাঁর গলার কাছটায় এসে আটকে গেছে, আর বিষম খেয়ে তাঁর কথা বলার ক্ষমতাও চ'লে গেছে। তাঁর রকমশকম দেখে ছেলেরাও দস্তুরমতো অবাক হ'য়ে গেলো, শেষকালে তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে তারাও যেই তাকালো অমনি তাদের নতুন সহপাঠীটি তাদের চোখে প'ড়ে গেলো। তৎক্ষণাৎ ফিশফিশ একটা গুনগুনানি শুরু হ'য়ে গেলো তাদের ভিতর, মৌচাকে ঢিল পড়লে যেমন হয়। 'কার বেলুন ওটা?' নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করলে। আর-

একটু পরে কোনো রকমে নিজের হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে ড্রিল স্যার যেই প্রশ্ন করতে গেলেন, 'কার বেলুন ওটা, শিগগির বলো,' অমনি ঢং ক'রে ঘণ্টা প'ড়ে তাঁর গলার স্বর ঢেকে দিলে। অন্য সময় হ'লে ঘণ্টার আওয়াজকে ছাপিয়েও তাঁর গলার স্বর ভারিক্কি-ভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো, আর তাই নিয়ে ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো, 'দেখতে কাঠির মতো হ'লে কী হয়, গলায় কী জোর দেখেছিস ?' কিন্তু এখন আর তাঁর গলা দিয়ে সরু একটুখানি আওয়াজ ছাড়া আর-কিছুই বেরোলো না, আর তা অনায়াসেই ঘণ্টার শব্দে চাপা প'ড়ে গেলো ; আর ফলে ছেলেরা সবাই হৈ-হৈ ক'রে নিজেদের ক্লাশঘরে চ'লে গেলো—কেননা তারা শুনতেই পেলো না তাঁর এই প্রশ্নটা।

এদিকে রঞ্জন তখন বেলুনকে চাপা গলায় কোনো রকমে বোঝাবার চেষ্টা করলো, 'লক্ষ্মী তো, সোনা আমার—আর দুষ্টুমি না, যথেষ্ট কেরামতি দেখিয়েছো তুমি। এখন আর ক্লাশঘরে ঢুকে আস্ত ঘণ্টাটাই পণ্ড ক'রে বোসো না যেন, দেখো। বরং এক কাজ করো তো, ঐ মস্ত মহানিম গাছটার ডালে গিয়ে ব'সে থাকো। ছুটি হ'লে আমি তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবো। কেমন, ঠিক তো ?'

বেলুন দিব্যি ভালো মানুষটির মতো শরীর ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে তৎক্ষণাৎ গিয়ে মহানিম গাছটার ডালের উপর গিয়ে ব'সে পড়লো। আর এবার তাকে শান্তশিষ্টের মতো কথা শুনতে দেখে রঞ্জনও নিশ্চিন্ত হ'য়ে গিয়ে ঢুকলো তার ক্লাশে। কিন্তু একলাটি ডালে ব'সে থাকতে কাঁহাতক আর ভালো লাগে—বিশেষ ক'রে আস্ত এই ইশকুল-বাড়িটায় যখন এক দঙ্গল ছেলে ক্লাশে ব'সে আছে। 'নিশ্চয়ই আরো-কোনো মজার ক্লাশ করছে ছেলেরা, এই ড্রিলের ক্লাশের চেয়েও আরো বেশি মজার—' যেই এ-কথা তার মনে পড়লো, অমনি অস্বস্তিতে তার শরীরে

যেন গুড়গুড়ি লেগে গেলো। কিছু একটা করতে পারলে হ'তো— সারা শরীরটা তার নিশপিশ ক'রে উঠলো নতুন-কিছু করার জন্য। কাজেই তৎক্ষণাৎ সে নেমে উড়ে এলো ক্লাশঘরগুলির দিকে, তারপর এক-এক ক'রে সব ক্লাশঘরেরই জানলা দিয়ে ভিতর দিকে তাকিয়ে শেষটায় অনেক কষ্টে আবিষ্কার করতে পারলো রঙ্গন কোন ঘরে আছে।

বেলুন যখন ক্লাশঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ার মতলব এঁটে দরজার কাছে এসে উঁকি দিলে, ছেলেরা তখন একসঙ্গে এমন ভাবে চ্যাঁচামেচি আর হৈ-হল্লা শুরু ক'রে দিলে যে হেডমাস্টারমশাই পর্যন্ত তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কী হচ্ছে দেখতে। শেষে যখন জানতে পারলেন যে একটা বেলুনের জন্য এমন কাণ্ড, তখন তাঁর চোখ কপালে উঠলো। প্রথমটায় চেষ্টা করলেন যাতে কোনো রকমে পাকড়ে গলা ধাক্কা দিয়ে বেলুনটাকে বের ক'রে দেয়া যায়, কিন্তু বেলুন ধরা দিলে তো!

চকচকে গোল টাক নিয়ে হেডমাস্টারমশাই একের পর এক উঁচু লাফ দিলেন, কিন্তু অত লম্ফঝম্প ক'রেও কোনো লাভ হ'লো না, কেবল ক্লাশের ছোটো ছেলেরা সমস্বরে হাততালি দিয়ে বেলুনকে উৎসাহ দিতে লাগলো, 'আরেকটু উপরে, বেলুন! আরেকটু! এই রে, এই বুঝি ধরা পড়লো। না তো, শাবাশ বেলুন, কী চমৎকার পাশ কাটিয়েছে দেখেছিস। অবশ্য হেডমাস্টারমশায়ের লাফগুলোও চমৎকার হচ্ছে—এবার স্পোর্টসের দিনে মস্ত এক সোনার মেডেল পাবেন নির্ঘাৎ। কী লাফ দেখেছিস—ওলিম্পিকের রেকর্ডও ভেঙে ফেললেন প্রায়। শুধু ওলিম্পিক কেন—হনুমান যখন সূর্যিঠাকুরকে বগলদাবা করার জন্য লম্ফ দিয়েছিলো, তখনো এতটা উঁচুতে উঠতে পারে নি। শাবাশ বেলুন—একটু বাঁ দিকে স'রে যাও। ঠিক হ্যায়, বহুৎ আচ্ছা!'

ল্যাম্পোস্টের বেলুন

শুধু কি এই? সেই সঙ্গে চটাপট চটাপট হাততালি পড়লো, কেউ-কেউ তো ফুর্তির চোটে বেঞ্চি-টেবিলেও চাপড় লাগিয়ে দিলে। অর্থাৎ যাকে বলে হুলুস্থুল কাণ্ড, সেই ব্যাপার আর-কি!

অনেকক্ষণ লম্ফঝম্প ক'রে হেডমাস্টারমশাই যখন দেখলেন যে ওই মারাত্মক বেলুনকে পাকড়াও করা তাঁর কর্ম নয়, তখন রেগে-মেগে তিনি থমকে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই, চুপ সব্বাই।'

তৎক্ষণাৎ ছেলেদের ফুর্তির শোরগোল মুহূর্তে থেমে গেলো—এমন কি, অমনভাবে উৎসাহ পেয়ে যে-বেলুন এতটা ফুলে উঠেছিলো দেমাকে, সে সুদ্ধু এই ধমকে কেঁপে উঠলো।

'কার বেলুন এটা?' ভীষণ থমথমে গলায় জিগেস করলেন হেডমাস্টারমশাই, আর রঙ্গনের মাথায় যেন বাজ পড়লো।

কোনো রকমে ছোট্ট একটুকরো আওয়াজ বের করলো সে গলা দিয়ে, 'আমার!'

'তোমার বেলুন? ইশকুলে নিয়ে এসেছো কেন। এটা কি খেলার জায়গা? পড়ার সময় এই সব খেলার শরঞ্জাম আনতে কতদিন না বারণ করেছি তোমাদের!'

রঙ্গন কোনো কথা না-ব'লে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

'এসো আমার সঙ্গে।' ব'লে রেগে-মেগে তিনি পাকড়াও করলেন রঙ্গনকেই। তার ডান হাতটা শক্ত ক'রে আঁকড়ে কুচকাওয়াজ ক'রে তিনি চললেন নিজের ঘরের দিকে।

বেলুন এই সব ব্যাপারস্যাপার দেখে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলো। যেভাবে তাঁর ধমকে আলপিন-পড়া স্তব্ধতা নেমে এসেছিলো, তাতেই সে বুঝতে পেরেছিলো ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের নয়। এবার যখন সে দেখলো যে তার দোষে খামকাই রঙ্গন বেচারি শাস্তি পেতে চলেছে,

তখন অনুতাপে সে প্রায় চুপশে গেলো যেন। তবু কিছু করা যায় কি না, এই কথা ভেবে সেও তৎক্ষণাৎ ক্লাশঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে তাদের পিছন-পিছন উড়ে গেলো।

গেলো বটে, কিন্তু সব উত্তেজনা তার উধাও হ'য়ে গেছে তখন। এতক্ষণ ছেলেদের হাততালি, চাঁচামেচি আর টেবিল-চাপড়ানির শব্দে তার ফুর্তির আর সীমা ছিলো না—দেমাকের চোটে ধরাকে একেবারে সরা জ্ঞান করেছিলো। কিন্তু এখন বুঝলো বড্ড বেয়াড়া একটা কাজ ক'রে ফেলেছে সে। কী ক'রে যে রঙ্গনকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করা যায়, তা সে ভেবে পেলো না। তার শরীরের ভিতরের সব হাওয়া তখন পারলে একেবারে জল-ভরা মেঘ হ'য়ে যেতো কান্নায়, অবশ্যি যদি তা সম্ভব হ'তো। তার উপর রঙ্গন তার দিকে একবারো তাকায় নি—অন্য ছেলেরা যখন ভীষণ উৎসাহে হৈ-হল্লা ক'রে উঠেছিলো, তখনো সে গম্ভীর হ'য়েই ছিলো। তার অবাধ্য হয়েছে ব'লে রাগ করেছে সে, হয়তো ঠিক করেছে একবারও তাকাবে না তার দিকে, কথাও বলবে না, 'আড়ি, আড়ি, আড়ি—এই তিন সত্যি করলুম,'—এমনি তার মুখ-চোখের চেহারা। এটা খেয়াল ক'রেও বেলুন বেচারা মরমে ম'রে গেলো আর-কি! যদি রঙ্গন কটমট ক'রে তাকাতো কি, ধমক দিতো তাকে, তাহ'লেও এতটা অপরাধী লাগতো না নিজেকে। কিন্তু কোনো কথাই বলছে না সে, তাকাচ্ছেও না। দুঃখে নিজেকে একবার ফাটিয়ে দেবার কথা ভাবলো বেলুন—কী লাভ পাৎলা শরীরের ভিতর হাওয়াটুকু ভ'রে রেখে, যদি রঙ্গনই তাকে ক্ষমা না করলো। পারলে সে বলতো যেন মুখ ফুটে, 'এই তাকাচ্ছো না কেন আমার দিকে? তাকাও, লক্ষ্মী তো—কথা দিচ্ছি আর কখনো ও-রকম করবো না।' কিন্তু ঘাড় নিচু ক'রে রঙ্গন হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে গিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকলো।

৪

কলেজ স্ট্রিটে যারা গেছো, তারা নিশ্চয়ই জানো যে, সেখানে অ্যালবার্ট হল নামে মস্ত এক বাড়ি আছে—আজকাল সেই বাড়ির দোতলায় আছে এক কফিখানা আর আছে কতগুলো বইপত্তরের দোকান। তেতলাতেও তাই আছে—সেই কফিখানারই এক অংশ তেতলায় অলিন্দের মতো জায়গাটায়। আগে যখন স্বদেশী আন্দোলনের সময় ছিলো, তখন নেতারা ওখানে চনচনে, গরম সব বক্তৃতা দিতেন। আর দোতলা-তেতলা সব জায়গায় মানুষের কালো-কালো মুণ্ডু দেখা যেতো কেবল, এত লোক হ'তো সেই সব বক্তৃতা শুনতে। আজকাল অমনভাবে সেখানে সভা হয়না বটে, কিন্তু মাঝে-মাঝে অনেকে ঘণ্টা-খানেক কি ঘণ্টা দুয়েকের জন্য কফিখানার এক অংশ ভাড়া নিয়ে সভাটভা ক'রে থাকে। সেদিন সকাল বেলায় সেখানে একটা ঐরকম সভা হবে, হেডমাস্টারমশাইয়ের সেখানে গিয়ে বক্তৃতা দেবার কথা। তিন দিন তিন রাত্রি ধ'রে তিনি নানা বইপত্র ঘেঁটে চকচকে সব কথা শানিয়ে রেখেছেন সেই সভায় বলবেন ব'লে, যে-সব কথা শুনে লোকে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে ভাববে 'কী চৌকশ উনি, আর ক-তো জানেন,' আর তাঁর নামজাদা বক্তৃতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে চারধারে। তা, সেই সভা আরম্ভ হবার আর মাত্র আর অল্পক্ষণ বাকি আছে, যেতে হ'লে এক্ষুনি রওনা হ'তে হয়। বিশেষ ক'রে তাঁকে বলতে হবে 'নিয়মানুবর্তিতা'

সম্বন্ধে—কাজেই তিনি নিজেই যদি দেরি ক'রে যান, তাহ'লে লোকে তাঁর সম্বন্ধে ভাববে কী। অথচ বেলুনের এই কাণ্ডকারখানায় উশকানি দিয়েছে ব'লে—'উশকানি না তো কী, আনলো কেন বেলুনকে সঙ্গে ক'রে—আনলো ব'লেই তো যত ফ্যাচাং বাঁধলো'—রঙ্গনকে নিয়ে তিনি যে কী করবেন, তা কিছুতেই ঠিক ক'রে উঠতে পারছিলেন না। মাথার ভিতর সব যেন তাঁর গুলিয়ে যাচ্ছিলো—এমনকি মনে-মনে শানিয়ে-রাখা চকচকে কথাগুলো পর্যন্ত তালগোল পাকিয়ে যাবার জোগাড়। অনেক ভেবেচিন্তে দেশি-বিদেশি পদ্যের লাইন মনে-মনে জড়ো ক'রে রেখেছিলেন বক্তৃতার ভিতর ব্যবহার করবেন ব'লে, অথচ সব এখন গুলিয়ে যেতে বসেছে। রঙ্গনের উপরেই রাগ হ'লো তাঁর বেশি—হতভাগা ছেলে! কিন্তু তাকে শাস্তি দেবার তোড়জোড় করতে গেলে ওদিকে আবার সভাতেই যাওয়া হ'য়ে উঠবে না। তাই তিনি করলেন কি, তাঁর ছোট্ট আপিশ ঘরটাতেই রঙ্গনকে বন্ধ ক'রে রাখলেন, 'থাকো এই ঘরে এখন বন্দী হ'য়ে—পরে তোমাকে আরো কড়া শাস্তি দেয়া হবে,' এই ব'লে দরজার পাল্লা দুটো লাগিয়ে তিনি একেবারে তালা বন্ধ ক'রে দিলেন, তারপর নিজেকেই বললেন মাথার উপর বেলুনটাকে দেখে, 'বেলুনটা একলাই দাঁড়িয়ে থাক দুয়ারের সামনে—দেখুক, ওর জন্য কী শাস্তি হয় ওর ছোট্ট প্রভুটির!'

কিন্তু বেলুনের মাথায় অন্য-এক মতলব এসে গেছে। এতক্ষণ ধ'রে সে শুধু ভাবছিলো, কী করলে রঙ্গনকে উদ্ধার করতে পারা যায়। এখন যখন তার চোখে পড়লো যে, হেডমাস্টারমশাই তালা বন্ধ ক'রে ঘরের চাবিটা নিজের পকেটের ভিতর রেখে দিলেন, তখন সে চট ক'রে তাঁর পিছন-পিছন বেরিয়ে এলো ইশকুল থেকে।

রাস্তায় নেমে হেডমাস্টারমশাই হনহন ক'রে চললেন অ্যালবার্ট

হলের দিকে। বেলুনও নির্বিকারভাবে নানারকম কায়দা ক'রে হেলেদুলে ঘুরপাক খেতে-খেতে তাঁর পিছন-পিছন চলতে থাকলো।

অনেকেই ছিলো যারা হেডমাস্টারমশাইকে ভালোভাবেই চিনতো। তারা যখন দেখলে যে তিনি একটা বেলুন নিয়ে হেঁটে চলেছেন, তখন তারা মাথা ঝাঁকিয়ে দস্তুরমতো উদ্বেগের সঙ্গে বলাবলি করলে, 'হেডমাষ্টারমশাই দেখছি বেলুন নিয়ে খেলাধুলো শুরু করেছেন! উঁহু! এটা তো ভালো কথা নয়, রাস্তার ভবঘুরে ছেলেদের মতো এভাবে খেলা করা তার উচিত না। দায়িত্বজ্ঞান ব'লে তো একটা কথা আছে—তিনি দেখছি তাকে সম্পূর্ণই অবহেলা ক'রে চলেছেন। সব জিনিষেরই একটা মানানসই ক্ষেত্র আছে—তাঁর হাতে বেলুন, এটা একেবারেই বেমানান।'

প্রথমটায় কিন্তু হেডমাস্টারমশাই কিছুই বুঝতে পারেননি। পরে যখন তিনি আবিষ্কার করলেন যে রাস্তার সকলে ভীষণভাবে অবাক হ'য়ে ভুরু মাথায় তুলে গোল-গোল চোখে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে, তখন তিনি দস্তুরমতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, বিষম একটা অস্বস্তিতেও পড়লেন তিনি। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না কেন হঠাৎ তিনি এমনতর এক দ্রষ্টব্য বিষয়ে পরিণত হলেন। লোকে যেমনভাবে চিড়িয়াখানার সব তাজ্জবমার্কা জীবজন্তু হনুলুলু ক'রে তাকিয়ে ছাখে, ঠিক তেমনিভাবেই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে কেন? শুধু তাই নয়, নানাভাবে ইঙ্গিত ক'রে পরস্পরের সঙ্গে কী সব যেন ফিশফিশ ক'রে বলাবলি করছে তারা! সেই গুঞ্জন অবশ্য ঝাপশাভাবে এক-আধটু তাঁর কানে এলো, কিন্তু প্রথমটায় কোনো রকম অর্থবোধই হ'লো না তাঁর—সবকিছু একটা দুর্বোধ হেঁয়ালির মতো ঠেকলো। আস্তে-আস্তে যখন লোকজনের ফিশফিশানি মস্ত প্রবল এক শোরগোলে

পরিণত হ'লো তখন তিনি পিছন ফিরে হতচকিতভাবে আবিষ্কার করলেন বেলুনের বদখেয়ালি কাণ্ড।

বেলুনটাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য কত যে তখন চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু—বেচারি—কোনোই লাভ করতে পারলেন না তাতে, বরং মাঝখান থেকে মজা দেখবার জন্য চারধারে অনেক হুজুগে লোক জমায়েৎ হ'য়ে গেলো। হৈ-চৈ হট্টগোল, আর নানা ধরনের মন্তব্যে, রাস্তার মাঝখানে সে এক কাণ্ডই হ'লো। আর এইসব দেখেশুনে আরো খেপে গেলেন তিনি—লাফালেন, ঝাঁপালেন, হাত তুললেন, হাত বাড়ালেন, দৌড়োলেন; টাল সামলাতে না-পেরে, পাঁচবার প'ড়ে গিয়ে সেই রাস্তার মধ্যেই ডিগবাজি খেলেন, কিন্তু না, বেলুন কি আর সহজে ধরা দেবার পাত্র? প্রত্যেকবারেই সে কায়দা-টায়দা ক'রে তাঁর নাগালের ঠিক এক আঙুল বাইরে থেকে গেলো। আর যতই হেডমাস্টারমশাই ভাবলেন যে, বেলুনটা ইচ্ছে ক'রে তাঁকে এ-রকমভাবে নাস্তানাবুদ করছে, ততই তাঁর রোখ চেপে গেলো। একে শায়েস্তা না-ক'রে তিনি এখান থেকে নড়বেন না, মনে-মনে এই জাতীয় সংকল্পও তিনি নিয়ে নিলেন।

এদিকে রাস্তার ভিড় তখন ফুটপাথ ছাপিয়ে বড়ো রাস্তায় উপচে পড়েছে; ঢং-ঢং ক'রে ঘণ্টা দিচ্ছে কণ্ডাক্টর, কিন্তু তবু ট্র্যাম সব বন্ধ হ'য়ে গেলো; বন্ধ হ'য়ে গেলো গাড়ি-ঘোড়া, বাস; লোকজনের হাততালি চ্যাঁচামেচি আর হাসি-মশকরার সঙ্গে তাল রেখে আওয়াজ হ'লো রিক্‌শোআলাদের হাতের ছোট্টমতো ঘুন্টিতে, আওয়াজ হ'লো বাসের মস্ত ভেঁপুতে, আর হাড়-জিরজিরে ঘোড়ায়-টানা ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ারাও গলাবাজিতে নেহাৎ কম গেলো না। চূড়ান্ত হ'লো তখন, যখন অনেক দূর থেকে ঘণ্টার আওয়াজ করতে-করতে টকটকে লাল রঙের দমকল ছুটে এলো পুরোদমে, কোন-এক বুদ্ধিমান নাকি এই
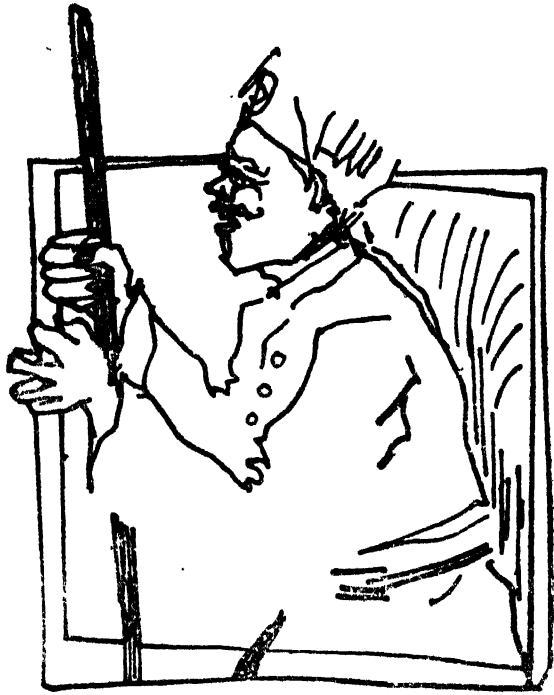
ফাঁকে দমকলের আপিশে ফোন ক'রে দিয়েছে ; তার পিছনে-পিছনে এলো অ্যাম্বুলেন্সের, ঘি-রঙের গাড়ি—আর সব শেষে অস্থির পেট্রোল ঝাড়তে-ঝাড়তে মাটি শুঁকে-শুঁকে এলো কুচকুচে কালো রঙের জালে-ঢাকা পুলিশের ভ্যান। কতগুলো উশকো-খুশকো রোগা, ঢ্যাঙ্গা, চোখা চেহারার যুবক যাচ্ছিলো চোঙা হাতে ক'রে রাস্তার কোণায় সভা করতে, তারা এই সুযোগে চোঙায় ফুঁ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ !' আর তাই শুনে ভিড়ের মধ্য থেকে হেঁড়ে গলায় একজন চেঁচিয়ে উঠলো, 'নারদ ! নারদ !' তৎক্ষণাৎ আরেকজন ফোঁড়ন কাটলো, 'লাগ, লাগ, লাগ ভানুমতীর খেল !' ততক্ষণে লালপাগড়ি মাথায়

মস্ত গালপাট্টাওলা পুলিশেরা লাঠি হাতে ক'রে নেমে পড়েছে কালো ভ্যান থেকে। তাই দেখে কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই রে, ফেউ লেগেছে;' অমনি ঝপাঝপ ক'রে চক্ষের পলকে ভিড়ের লোকেরা হাওয়া হ'য়ে গেলো। হতভম্ব দমকলের লোকেরা দেখলো টেকো মাথার এক ভদ্রলোক একটা লালরঙের বেলুনকে পাকড়াও করবার জন্য তিড়িং-তিড়িং ক'রে লম্পঝম্প দিচ্ছেন।

এতক্ষণ শোরগোলের জন্য হেডমাস্টারমশাই পুলিশের গাড়ি কি অ্যাম্বুলেন্সের ছোট্ট লাল ঢাকা কিছুই লক্ষ করেন নি, এমনকি দমকলের জলের পাইপ পর্যন্ত না। হঠাৎ এখন এক নিমেষে সব শোরগোল থেমে যেতেই তাঁরও উৎসাহ কেমন একটু ঝিমিয়ে এলো। তারপর যখন এই চুপচাপ ভাবটা ঠিক একটা ভারের মতো তাঁর বুকে চেপে বসলো, অমনি সব কিছু তাঁর চোখে প'ড়ে গেলো। তাড়াতাড়ি জিভ কেটে তিনি লাফঝাঁপ বন্ধ ক'রে দিয়ে ধুলোবালি-লাগা জামাকাপড় ঝাড়তে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। আর ঠিক এমন সময়ে সুযোগ পেয়ে মোড়ের মাথার সেই শাদা-পোশাক-পরা ট্র্যাফিক পুলিশটি ছোট্ট একটা নোটবই হাতে এগিয়ে এলো।

'আপনাকে নাম-ঠিকানা বলতে হবে,' ছোট্ট ক'রে পুলিশটি বললে।

'কেন?' বেচারি হেডমাস্টারমশায়ের মুখচোখ শুকিয়ে একেবারে আমশি হ'য়ে গেলো।

'আপনার সার্কাসের দরুণ রাস্তার গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো। বিনানুমতিতে রাস্তার ভিতর উত্তেজনা ঘটানোর দরুণ আপনার নামে অভিযোগ করা হবে।' পুলিশটির গলা ভীষণ গম্ভীর।

'অ্যাঁ!' হেডমাস্টারমশাই প্রায় কেঁদেই ফ্যালেন আর-কি! তাঁর মুখচোখের করুণ অবস্থা দেখে পুলিশটিই নিজের পকেট থেকে

ল্যাম্পোস্টের বেলুন

মস্ত এক রুমাল বের ক'রে দিয়ে তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলো, রুমালটি নিয়ে হেডমাস্টারমশাই মুখের উপর চেপে ধ'রে নাক ঝেড়ে ইংরেজিতে একটু কান্নাকাটি করলেন। একটু যখন সামলে নিলেন, তখন পুলিশটি বললো, 'বলুন, আপনার নাম-ধাম আর পেশা।'

হেডমাস্টারমশাই এবার তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, 'দেখুন, আমি একটা ইশকুলে আজ বারো বচ্ছর ধ'রে হেডমাস্টারি করছি, এখন আমার নামে যদি এইসব গুজব ফলাও ক'রে কাগজে বেরিয়ে যায় তাহ'লে চারদিকে একেবারে ঢি-ঢি প'ড়ে যাবে—অভিভাবকেরা সবাই ছেলেদের এই ইশকুল থেকে নিয়ে গিয়ে অন্য ইশকুলে ভর্তি করিয়ে দেবেন—আস্ত ইশকুলটাই বন্ধ হ'য়ে যাবে, আর এতজন মাস্টার-মশাইকে নিয়ে দপ্তরি, দারোয়ান, কেরানি, বেয়ারা-সমেত সবাই আপাদ-মস্তক বেকার হ'য়ে যাবে। এটা কি খুব ভালো হবে! পরোক্ষভাবে আপনি দেশের বেকার সমস্যা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা কতটা বাড়িয়ে দেবেন, দেখুন।' হেডমাস্টারমশাইয়ের মনে প'ড়ে গেলো যে আজ তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিলো, নিয়মানুবর্তিতাকে অবহেলা করার ফলে বেকার সমস্যার জটিলতা কতটা বেড়ে যায়। 'তাছাড়া, বারো বচ্ছর ধ'রে মাস্টারি করলে জানেন তো আদালতের জুরি পর্যন্ত করা হয় না—সেখানে যদি এই কেলেঙ্কারিটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ছড়িয়ে দেয়া হয়, তাহ'লে…'

পুলিশটি দেখলো যে সাংঘাতিক এক ভ্যানতাড়া বিপদে পড়া গেলো, এখন না তারই উপর মস্ত এক ভ্যাজর-ভ্যাজর বক্তৃতা চালিয়ে দেয়া হয়, তাই সে তাড়াতাড়ি তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, সব বুঝেছি। এবারকার মতো আপনাকে মাপ ক'রে দিলুম। আর কোনোদিন রাস্তায়-ঘাটে এভাবে নিজের কারদানি দেখাবেন না। বেলুন

নিয়ে যদি খেলাধুলো করতে হয়, তো, হয় বাড়িতে নিজের ঘরে ব'সে করবেন, নয়তো আগে থেকে অনুমতি নিয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলি ক'রে রীতিমতো একটা সার্কাস-পার্টি খুলে দিতে পারেন। সাবধান থাকবেন, আর যেন কোনো গণ্ডগোল না-হয়।'

কোনো রকমে হাঁপ ছাড়লেন হেডমাস্টারমশাই। ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তাই হবে।'

'এবার আমার রুমালটা দিন,' ব'লে পুলিশটি হাত বাড়িয়ে দিলো।

তাড়াতাড়ি তার হাতে রুমালটা তুলে দিয়ে হেডমাস্টারমশাই স্বস্তির নিশ্বেস ছাড়লেন। আর নয়, খুব হয়েছে কেলেঙ্কারি, এই হতচ্ছাড়া বেয়াড়া বেলুনটাকে ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে যা কাণ্ড হ'লো! 'ঘাট মানছি আমি—রীতিমতো এক বাস্তু ঘুঘু এই বেলুনটা।' মনে-মনে এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে কাঁদো-কাঁদো মুখ ক'রে তিনি গিয়ে অ্যালবার্ট হলে পৌঁছুলেন। বেলুনটি তো নাছোড়বান্দা—সেও দিব্যি অ্যালবার্ট হলের বাইরে দাঁড়িয়ে আরেক সোনালি সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলো যখন আবার তাঁর তড়পানি বন্ধ করিয়ে নাজেহাল ক'রে ছাড়বে একেবারে।

বক্তৃতা যা দেয়ার ছিলো, সব গুলিয়ে গিয়েছিলো! যা তিনি বললেন, তাই শুনে যথেষ্ট হাসির রোল উঠলো চারধারে—এবং তাই দেখে ঘাবড়ে আরো যে-সব কথা তিনি বললেন, তা শুনে হাসতে-হাসতে প্রায় মেঝেতেই গড়িয়েই পড়লো সবাই। শেষে হতভম্ব হ'য়ে বক্তৃতা থামিয়ে দিলেন হেডমাস্টারমশাই, খুব গম্ভীর ও বিষণ্ণ মুখে আস্তে-আস্তে নেমে এলেন তেতলা থেকে। বেরিয়ে এসেই দেখলেন, বেলুনটি ঠিক কাবুলিওলার মতো অপেক্ষা ক'রে আছে তাঁর জন্য।

বেলুনটিকে দেখেই তাঁর কান্না পেয়ে গেলো প্রায়। কোনো কথা

না-ব'লে আস্তে-আস্তে তিনি ইশকুল-মুখো রওনা দিলেন—অমনি দেখা গেলো বেলুন আবার আগের মতো চলেছে তাঁর পিছন-পিছন। এবারও যখন রাস্তাঘাটের লোকজনেরা তাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নানারকমের কথাবার্তা শুরু ক'রে দিলো, তখন তিনি কোনোই উচ্চবাচ্য করলেন না। সে-ক্ষমতাই তাঁর ছিলো না—ভিতরটা যেন কি রকম ফাঁকা আর খালি ঠেকছিলো, যেন মস্ত [illegible] হৃৎপিণ্ড, ফুশফুশ কিছুই নেই বুকের ভিতর।

গম্ভীরভাবে বিবর্ণ মুখ ক'রে তিনি ইশকুলে ঢুকলেন, তারপর আর কোনো কথা নয়, সোজা গেলেন নিজের আপিশঘরে, পকেট থেকে চাবির গোছা বের ক'রে কাঁপা হাতে দরজা খুলে দিয়ে বঙ্গনকে বের ক'রে আনলেন। তারপর কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, 'আর কোনো দিন যেন বেলুনকে নিয়ে ইশকুলে আসিস না। কী? মনে থাকবে তো?'

বঙ্গন মোটেই ভাবে নি যে এত সহজে রেহাই পাবে। তাড়াতাড়ি বললো, 'না, স্যার। আমার অন্যায় হ'য়ে গিয়েছিলো ওকে নিয়ে-আসা—আর ককখনো আনবো না, কথা দিচ্ছি।

যখন বঙ্গন আর বেলুন ইশকুলের সীমানা পেরিয়ে গেলো তখন আর হেডমাস্টারমশাইয়ের খুশির সীমা রইলো না।

৮

'বুঝলে বেলুন,' রঙ্গন হাঁটতে-হাঁটতে খুব ভারিক্কি মুখে বেলুনকে বোঝাবার চেষ্টা করলো 'তোমার জন্যে চারদিকে আমার মানসম্ভ্রম বজায় রাখা দায় হ'য়ে পড়েছে। তুমি নিজেই বলো, তোমাকে নিয়ে আমি এখন করি কী!'

বেলুন কিন্তু ফুর্তিতে তিনবার ডিগবাজি খেলো রঙ্গনের কথা শুনে। যাক, রঙ্গন তাহ'লে শেষ পর্যন্ত কথা বললো তার সঙ্গে! সে তো ভেবেছিলো বিষম রেগেছে বুঝি তার ছোট্ট বন্ধুটি, হয়তো জীবনে আর কথাই বলবে না তার সঙ্গে। তাছাড়া, হাঁ, তার কৃতিত্বটাও বা কম নাকি। কী-রকম নাজেহালটা করলো সে হেডমাস্টারমশাইকে, একেবারে 'জব্দ করা' যাকে বলে, আক্কেল সুদ্ধু গুড়ুম ক'রে দিয়েছিলো। নিজের কৃতিত্বে সে নিজেই মুগ্ধ হ'য়ে গেলো। রঙ্গন অবশ্য জানে না কী ভাবে সে হেডমাস্টারমশাইকে দস্তুরমতো ঘায়েল ক'রে দিয়েছে; কিন্তু তাহ'লেও তার গৌরব তো আর তাতে কমে নি এক ফোঁটাও।

'শোনো বেলুন,' রঙ্গন আবার শুরু করলো, 'এমনভাবে গায়ে ফুঁ দিয়ে হেসে-খেলে বেড়ালেই কি আর দিন চলবে ব'লে ভেবেছো? আদব-কায়দা ব'লে তো একটা কথা আছে, অনেক চেষ্টা ক'রে সেটাকে রপ্ত ক'রে নিতে হয়। হ'তে হয় বিনীত, ভদ্র, আর সুবোধ। কিন্তু তোমার কাণ্ডকীর্তির ছোট্ট দু-একটা নমুনা যা দেখিয়েছো তাতে মনে

হয় ও-সব ব্যাপার তোমার খুব-একটা আসে না। কিন্তু তাহ'লে তো আর চলবে না—ধীরে-ধীরে তোমাকে এই সব ছেলেমানুষি কাটিয়ে উঠতে হবে।'

'তাই নাকি। বড়ো যে লম্বা সব বক্তৃতা ঝাড়ছো, নিজে কী?' এমন একটা ভঙ্গি ক'রে বেলুন রঙ্গনের ঠিক নাকের কাছে চটপট তিনবার ডিগবাজি খেয়ে নিলো।

'যাক গে, আর-কখনো তুমি যেন বেয়াদবি কোরো না, তাহ'লে জীবনে তোমার সঙ্গে আর একটাও কথা বলবো না। কী, মনে থাকবে তো?' এই ব'লে রঙ্গন তার শেষ চাল চেলে দিলে, যাতে বেলুন একটু ভড়কে যায়। হ'লোও তাই, এই মহাগম্ভীর সাবধান-বাক্য শুনে বেলুন খুব ঘাবড়ে গেলো। শান্তশিষ্টভাবে সে রঙ্গনের সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগলো রাস্তা দিয়ে, বন্ধ রাখলো তার ডিগবাজি আর চর্কিপাক, থামিয়ে দিলো এ-কাৎ ও-কাৎ হওয়া, অর্থাৎ তার সব রকম বারফট্টাই। এই একটা জিনিশ সে বুঝতে পারে না—বড়ো অদ্ভুত জীব এই মানুষেরা—পান থেকে চুন খশলেই রাগ ক'রে বসে, আর একটুতেই অভিমান ক'রে ব'সে সব সম্পর্ক পট ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। আর একবার চিড় খেলে আর-কিছুতেই—ইচ্ছে থাকলেও—তারা তা জোড়া লাগাতে পারে না। তা মানুষেরা যখন এমনি বেয়াড়া জীব, তখন সেটাকে মেনে সমীহ ক'রে চলাই ভালো—অবশ্য রঙ্গন এখনো ছেলেমানুষ আছে, সেটাই একমাত্র ভরসা; শুধু ছেলেমানুষেরাই তো পারে কথায়-কথায় আড়ি দিতে আর ভাব পাতাতে। বুড়োধাড়ি হ'য়ে গেলে এই সব সরল ক্ষমতায় সবাই ইস্তফা দেয়। সেই জন্যেই তো বুড়োদের সে পছন্দ করে না। কেমন নাকানি-চুবানি খাইয়ে দিলো হেডমাস্টারমশাইকে। যেই এ-কথা ভাবা অমনি ফের একবার সে খুশিতে চটপট ডিগবাজি খেয়ে নিলো।

পথে অনেকগুলি বইয়ের দোকান পড়ে। একটি দোকানের ঠিক সামনেই এক কাচের দেরাজ, তার ভিতর রংচঙে মলাটওলা নানাধরনের চকচকে সব বই সাজিয়ে রাখা; মাঝে-মাঝে আবার দু-একটি ছবিও আছে। রঙ্গনকে একটি ছবি অনেক দূর থেকে যেন ডাক দিলে—এত ভালো লাগলো তার যে কিছুতেই কাছে না-গিয়ে পারলে না। বেশ কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকলো ছবিটার সামনে। বেলুনও এলো তার পিছন-পিছন, কিন্তু ছবিটা দেখে সে এমন কিছু আকর্ষণ বোধ করলে না যার জন্যে এমনিভাবে বোকার মতো হাঁ ক'রে থাকা যায় ব'লে তার মনে হ'লো। রঙ্গনের ঠিক পিছনে শূন্যে ভাসতে-ভাসতে সার্কাসওলাদের মতো নানা রকম ভঙ্গি করতে লাগলো সে—রঙ্গন যদি খেয়াল করতো তবে নির্ঘাৎ দেয়ালের কাছে তার ঝাপসা ছায়া দেখতে পেতো। কিন্তু ছবিটা ছাড়া আর কিছুই দেখছিলো না রঙ্গন। ছোট্ট একটা রেশমের বল নিয়ে বাচ্চা ফুটফুটে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে—সাতরঙা এই ছবিটার বিষয়বস্তু হ'লো এই। গ্ল্যাক্সোর কৌটোর গায়ে যেমন সব বাচ্চা ছেলেমেয়ের ছবি দেখা যায়, অনেকটা সেই রকম ফোলা-ফোলা গাল আর ঝাঁকড়া চুল—কিন্তু রঙ্গনের মনে হ'লো সে যেন কোনো রূপকথার রাজকন্যা—ছবির ফ্রেম-এর ভিতর থেকে আলতো হেসে সে যেন আলগোছে অলক্ষ্যে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে দুই হাত, ঠিক একেবারে আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে। যদি কোনো রকমে রঙ্গন একবার ঐ ফ্রেমের ভিতর চ'লে যেতে পারে তাহ'লে ঐ সাত রঙের মিশোল যেন তক্ষুনি চঞ্চল-সুন্দর এক প্রজাপতি হ'য়ে উঠবে, হাওয়া লাগবে পিছনের মস্ত সব গাছপালার ডালেপালায়, গন্ধ ছড়িয়ে দেবে সব দূরের দেশের হালকা ফুলেরা, আর হাত ধরাধরি ক'রে হাসতে-হাসতে রঙ্গনকে

মেয়েটি যেন নিয়ে যাবে সেই গাছপালার আড়ালে মস্ত এক শ্যামল প্রাসাদে, যার গম্বুজের আড়াল থেকে বাঁকাভাবে উঁকি দিচ্ছে রামধনুর বাঁকা একটি টুকরো। আসলে গম্বুজের ঐদিকে রামধনুর সিঁড়ি চ'লে গেছে আকাশের শেষ সীমার দিকে—সব শেষে সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে-উঠে তারা চ'লে যাবে আকাশ ছাড়িয়ে আরো দূরে। কিন্তু তা তো আর হয় না—এটা কেবলি একটা ছবি, আর রঙ্গন হ'লো পৃথিবীরই এক বাসিন্দে। কাজেই কোনো দিনই ছোট্ট ক'রে হেসে রঙ্গন কিছুতেই গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না ছবির ঐ ফ্রেমের ভিতর, কিছুতেই তা পারবে না। তাই সে কেবল মনে-মনে ভাবলে, আহা, আমার যদি এমনতর কোনো বন্ধু থাকতো তাহ'লে কী ভালোই না হ'তো!

ঝাপশা এক বিষাদে ভ'রে গেলো তার মন। কেমনতর যেন এক মন-খারাপ-করা ভাব ঢেউয়ের মতো কেঁপে-কেঁপে ছড়িয়ে পড়লো তার রক্তের ভিতর। আর সেই জন্যেই একটু পরেই যে-অবাক কাণ্ডটা ঘটলো, প্রথমটায় সে তা ভালো ক'রে লক্ষই করতে পারেনি। অবাক না তো আর কী! ঐ বইয়ের দোকানটি ছেড়ে আরেকটু এগোতে-না-এগোতেই সত্যি-সত্যি এক ফুরফুরে বাচ্চা মেয়ের মুখোমুখি এসে পড়লো রঙ্গন—ঠিক ছবির সেই মেয়েটির মতো দেখতে, এত সুন্দর! পরনে তার সুন্দর একটি ঢিলে ঘাঘরা, আর ফরশা আঙুলের ভাঁজে সে ধ'রে আছে পাৎলা-নীল রঙের একটি বেলুনের সুতো। চোখ দুটির কালো তারার ভিতরে চঞ্চল এক আশ্চর্য আলো ফুটে বেরোচ্ছে,—কোনো দিকেই স্থির হ'য়ে পড়ছে না, অধীরভাবে এলোমেলো পড়ছে সব কিছুর উপরেই, আর ছোট্ট একেকটা ফুলকির মতো যেন সব কিছুকেই একটুক্ষণের জন্যে ঝলমলে ক'রে দিয়ে যাচ্ছে।

তাকে দেখেই রঙ্গনের ইচ্ছে হ'লো, তার সঙ্গে ভাব পাতিয়ে নেয়। আর তখনি তার মনে পড়লো তার সেই লাল বেলুনের কথা। মনে-মনে সে ঠিক ক'রে নিলে যে, তার নিজের বেলুনটি আশ্চর্য সব জাদু জানে সেটা দেখিয়ে এই মেয়েটিকে তাক লাগিয়ে দেবে। কিন্তু লাল বেলুন আবার তার দুষ্টু ফন্দিফিকির শুরু ক'রে দিলে, কিছুতেই নিজেকে ধরা দিলে না।

অনেক দিন আগে রঙ্গন একবার মায়ের সঙ্গে ম্যাজিক দেখতে গিয়েছিলো। শাদা ধবধবে দাড়ি নিয়ে মস্ত আলখাল্লা গায়ে ম্যাজিকওলা এসে দাঁড়ালেন মঞ্চের উপর, হাতে তাঁর পেট-ফোলা এক সাপ-নাচানো মস্ত বাঁশি; তাঁর পিছন-পিছন এলো এক যুবক মাথায় মস্ত এক বাঁশের ঝাঁপি নিয়ে। সবাই তো অবাক—তাহ'লে কি এবার সাপের

খেলা দেখানো হবে? কিন্তু দেখা গেলো সব্বাই ভুল কথা ভেবেছে। ঝাঁপির ভিতর থেকে বেরোলো মস্ত এক পাক-দেয়া দড়ি, যখন ম্যাজিকওলা তাঁর বাঁশিতে সুর ক'রে ফুঁ দিলেন। ধীরে-ধীরে ঘুরে-ঘুরে ভাঁজের পর ভাঁজ খুলে মস্ত এক সাপের মতো ফণা তুলে খাড়া হ'য়ে দাঁড়ালো দড়ির একটি প্রান্ত, তারপর কেঁপে-কেঁপে সোজা উঠলো শূন্যের দিকে। আর শুধু তাই নয়—সেই যুবক ছেলেটি আস্তে-আস্তে সেই দড়ি বেয়ে উঠলো উপরে, তারপর সেই দড়ির ডগার উপর বুক রেখে শূন্যেই খেলা দেখালো নানা রকম। কিন্তু ব্যাপারটা যে-জন্য রঙ্গনের মনে আছে এতদিন ধ'রে, তা কিন্তু এই জাদুর জন্যে নয়। হঠাৎ কেন যেন সেই সাপ-নাচানো সুরে তাল কেটে গেলো একটুক্ষণের জন্যে, অমনি বানচাল হ'য়ে গেলো দড়ির খুঁটি, হুড়মুড় ক'রে ছেলেটি টাল সামলাতে না-পেরে নিচে প'ড়ে গেলো মুখ থুবড়ে। থুৎনির কাছটায় কেটে গিয়েছিলো তার, একটা দাঁতও নাকি ভেঙে গিয়েছিলো। রঙ্গনের মনে হ'লো, এখন বুঝি বেলুনটিও সেই আলখাল্লা-পরা ম্যাজিকওলার মতো ব্যবহার করলে তার সঙ্গে। শূন্যে তুলে তাকে যেন ধপাশ ক'রে মস্ত এক আছাড় দেয়া হ'লো। যখন কিনা সে জাঁক ক'রে মেয়েটিকে বললে, 'জানো, আমার বেলুনকে আমি যা বলি, তাই শোনে খুব বাধ্যভাবে,' তখন কিনা বিশ্রীভাবে সে ঠিক তার উল্টোটাই ঘটিয়ে দিলো। কিছুতেই শূন্যে থেকে নামলো না, কিছুতেই ধরা দিলো না রঙ্গনের হাতে—বরং আগের মতো সমানে এক নাগাড়ে হয় ডিগবাজি খেলো, নয়তো নাগরদোলার মতো বন-বন ক'রে ঘুরলো ঠিক তার মাথার উপর। কোনো রকমেই যখন রঙ্গন লাল বেলুনের সুতো ছুঁতেও পারলো না, ছোট্ট মেয়েটি তখন খিলখিল ক'রে হাসতে শুরু ক'রে দিলো।

লজ্জায় রঙ্গন তো মুখই তুলতে পারে না মাটি থেকে। মেয়েটি

তবে তাকে ভাবলে মস্ত এক চালিয়াৎ ব'লে—ওপরচালাকি ক'রে যারা ঘুরে বেড়ায়! ভীষণভাবে হাত কামড়াতে ইচ্ছে করলো তার। নাঃ, এমন কোনো বেয়াদবকে আর-কিছুতেই প্রশ্রয় দেয়া যায় না। কিছুতেই সে কথা বলবে না তার সঙ্গে, তার পায়ে মাথা কুটে ম'রে গেলেও না, কথাও বলবে না ভাবও রাখবে না—কোনো সম্পর্কই নেই তার সঙ্গে আর—'কে তুমি বাপু জ্বালাতে এসেছো? তোমাকে তো আমি চিনিনা,' নির্ঘাৎ সে এই কথা তাকে ব'লে দেবে।

কান্না পেয়ে গেলো তার। নির্ঘাৎ মেয়েটি মস্ত এক ভুল ধারণা ক'রে গেলো তার সম্বন্ধে! সব কিন্তু হ'লো বেলুনটির জন্য—সে যা, তা-ই তো মেয়েটিকে বলেছিলো রঞ্জন, কেবল বলার সময় জমকালো একটা ভঙ্গি করেছিলো নিজের সম্বন্ধে। তা, সেটা আর এমন কী দোষের? 'এটা তো বাপু মানতেই হয় যে তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুতা আছে, কাজেই বন্ধুর ক্ষমতায় আমি যদি একটু দেমাক দেখিয়ে থাকি, তাহ'লে সেটা এমন কী অন্যায় হ'লো, শুনি?' এই সে ভাবলো মনে-মনে। মুখ না-তুলেই সে বুঝে নিয়েছিলো যে মেয়েটি খিলখিল ক'রে হাসতে হাসতে চ'লে গেছে—এখন মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো ঠিক তা-ই হয়েছে, ধারে-কাছে কোথাও সেই মেয়েটি নেই—না দেখা গেলো তাকে, না দেখা গেলো তার পাৎলা-নীল রঙের বেলুনটিকে।

ভীষণ রাগ হ'লো রঞ্জনের। কী বিশ্রী হ'লো ব্যাপারটা। নাঃ, সে যা বলে তা যদি বেলুনটা কখনো না-করে, তবে তাকে আদব-কায়দা শেখানোই বা যায় কী ক'রে, আর শিখিয়েও বা কী লাভ! ফল যা হবে তা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—কেবল তো নিজের সময় নষ্ট, আর খামকাই অনেক পরিশ্রম! 'ধুত্তোরিকা!' জগৎ-সংসার সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে তেঁতো গলায় সে ব'লে উঠলো আপন মনে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কতগুলো রাস্তার ছেলে লাল বেলুনটাকে ধরবার জন্যে হৈ-চৈ হট্টগোল ক'রে চারদিক থেকে তুমুলভাবে ছুটে এলো; ছেলেগুলোর তো খেয়ে-দেয়ে কোনো কাজ নেই, ইশকুল পালিয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় সর্বক্ষণ: এর বেলুন কেড়ে নেয়, ওর মারবেল নেয় ছিনিয়ে, তার ছবির বইয়ের পাতা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ঘুড়ির ল্যাজ বানায়, আর কেবল হল্লা ক'রে টো-টো কোম্পানির বিনি মাইনের ম্যানেজারি করে। তারা যখন দেখলে সুন্দর একটি লাল বেলুন উড়ে চলেছে একটি ইশকুল-ফেরতা ছোটো ছেলের পিছন-পিছন, তখন তারা ঠিক করলে, 'এসো, আজকের দিনটা ওই লাল বেলুনটাকে নিয়ে খেলা ক'রেই কাটিয়ে দেয়া যাক।'

তা, বেলুনটি তো সাত-সকালেই এমনি একদঙ্গল ছেলের পাল্লায় পড়েছিলো: কোনো রকমে সময়মতো তাদের কুমতলব বুঝে ফেলেছিলো ব'লেই সেবার আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলো। এবার সে দূর থেকেই যখন এত হৈ-চৈ শুনলে, তখুনি বিপদের গন্ধ পেলো, আর সঙ্গে-সঙ্গেই ভয় পেয়ে ঠিক একেবারে রঞ্জনের গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ালো। রঞ্জন তো এই সব রাস্তার ছেলেদের বেমক্কা হট্টগোলের কথা অল্প-স্বল্প জানে, কাজেই সে আর একটুও দেরি করলো না। এমনকি বেলুনকে ধমক দেবার কথা পর্যন্ত বেমালুম ভুলে গেলো সে, তক্ষুনি সোজা ছুটতে শুরু ক'রে দিলো বেলুনের সুতোটা হাতে ক'রে। কিন্তু ছেলেগুলোও তো শয়তানি বুদ্ধিতে কম যায় না। এ-রকম কিছু যে হ'তে পারে, তা তারা আগেই আঁচ করেছিলো। কাজেই গোড়াতেই তারা দু-দলে ভাগ হ'য়ে গিয়েছিলো—আর তাই একটু পরেই রঞ্জন যখন দেখলো যে আরেকটা দল তার সামনের দিক থেকে হা রে রে রে করতে-করতে পথ আটকে ছুটে আসছে, অমনি তার মুখ শুকিয়ে গিয়ে

কাগজের মতো শাদা হ'য়ে গেলো। ফ্যাকাশেভাবে সে চমকে থেমে গেলো, আর তার মনে হ'লো মস্ত এক মাছের কাঁটা যেন হঠাৎ তার গলায় আটকে গেলো। তক্ষুনি সে বেলুনের সুতো ছেড়ে দিলে, কোনোরকমে ঢোঁক গিলে ভয়-পাওয়া গলায় বললে, 'বেলুন, তুমি এক কাজ করো—অনেক উঁচুতে উঠে সোজা বাড়ির দিকে উড়ে যাও—আমি হেঁটেই বাড়ি ফিরছি।'

দেখতে-না-দেখতে ডানা-মেলা এক পাখির মতো বেলুন সোজা উঠে গেলো আকাশে, আর সকলের মাথার উপর দিয়ে নানাভাবে ডিগবাজি খেতে-খেতে চট ক'রে লাল মেঘের পাৎলা ভেলার মতো ভেসে চ'লে গেলো দূরে। ছেলেগুলো সব গোল-গোল চোখে হাঁ-করা মুখে হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকলো বেলুনের দিকে।

বাড়ি পৌঁছেই রঙ্গন ছুটে উঠলো সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায়, তারপর ঝোলানো বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বেলুনের নাম ধ'রে ডাকলো, আর ছেলেরা সবাই অবাক হ'য়ে দেখলো—আরে! কী আশ্চর্য!—বেলুনটা সত্যিই আস্তে ক'রে নেমে এসে রঙ্গনের গায়ের সঙ্গে নিজের শরীর ছুঁইয়ে হাওয়ায় এলোমেলোভাবে দুলতে শুরু ক'রে দিয়েছে! জুলজুল চোখে তারা উপরের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বেলুন আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বন-বন ক'রে কয়েকবার পাক খেয়ে নিলো রঙ্গনের চার পাশে।

কোনো রকমে যখন হাঁপ ছাড়তে পারলো রঙ্গন, তখন অসম্ভব খুশি গলায় বললে, 'বাব্বা! তোমাকে নিয়ে রাস্তায় বেরুলেই দেখছি যত রাজ্যের আপদ এসে জোটে। তবু যে শেষ অবধি আস্তভাবে দু'জনে, বাড়ি ফিরতে পারলাম এটাই ভাগ্য বলতে হয়।' এই পর্যন্ত কথাগুলো বেলুন বেশ মনোযোগ দিয়েই শুনলে, কিন্তু তারপরেই রঙ্গন যখন তার বেয়াদবি বিষয়ে মস্ত সব বোলচাল আরম্ভ ক'রে দিলো, তক্ষুনি সোজা

ডিগবাজি খেতে-খেতে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো। উঁহু, এ-সব বক্তৃতা সে কিছুতেই কানে শুনতে পারে না।

সত্যি, লোকে যে কেন অন্যদের উপদেশ আর স্থপরামর্শ দিতে চায়, তার কোনো মানেই খুঁজে পাওয়া যায় না। একেবারেই অর্থহীন তা— কারণ শেষ পর্যন্ত নিজেদের ইচ্ছেকে এড়িয়েই বা যাবে কোথায় সবাই। বেলুনের ভিতরে যদি আবার সব ফন্দিফিকির উশখুশানি স্থরু ক'রে দেয়, তাহ'লে তার সাধ্য কী তাকে ঠেকিয়ে রাখে ?

৬

পরের দিন তো রবিবার।

তা সব রোববারেই তো মায়ের সঙ্গে মাসিমনিদের বাড়িতে যেতে হয় রঙ্গনকে, সেদিনও যাবার কথা। সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে চায়ের টেবিলে গিয়ে বসতেই হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেলো, 'তাই তো, এখন তবে কী করা যায়?' মা-মনি তো বেলুনটাকে দেখেই রেগে তিনটে হ'য়ে জানলা দিয়ে বের ক'রে দিয়েছিলেন, তাই এখন যখন দেখবেন রঙ্গন সঙ্গে একটা বেলুন নিয়ে চলেছে তখন যে কী বিষম রাগ ক'রে বসবেন তা তো সহজেই বোঝা যায়। যেই সে এ-সব কথা ভাবলো, অমনি চায়ের স্বাদ পর্যন্ত তার কাছে নষ্ট হ'য়ে গেলো।

'কী? তোর আবার কী হ'লো? খাচ্ছিস না কেন?'

'খাচ্ছি তো!' সোনালি রঙের ধোঁয়া-ওঠা চায়ের দিকে তাকিয়েই ছোট্ট ক'রে উত্তর দিলো রঙ্গন।

'কই খাচ্ছিস? ওই তো রুটি-মাখন প'ড়ে রইলো—ডিম সেদ্ধও তো দাঁতে কাটিস নি।'

'এত বেশি ভালো লাগে না মা।'

'বেশিটা হ'লো কোথায়। মাত্র তো রোগা দু-টুকরো রুটি, তাও দেখি তোর রোচে না।'

রঙ্গন কোনো উত্তর না-দিয়ে চায়ে চুমুক দিলো।

'নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।' মা প্রায় ধ'রেই ফ্যালেন আর কি তার মন-খারাপের কারণ। 'বল তো কী হয়েছে, যার জন্যে সকাল বেলাতেই অমন শুরু ক'রে দিয়েছিস!'

রঙ্গন বেচারি ভেবেই পেলো না কী বললে এখনকার মতো এই জেরার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। চট ক'রে সে অন্য একটা কথা পাড়লো, 'মাসিমনিদের বাড়িতে তো বেশ মোটা রকমের খাবার হবে, তাই না?'

মা হেসে ফেললেন। 'সেই জন্যে তুই এখন খাবি নে? খিদে জমাচ্ছিস! বোকা ছেলে!'

যখনি মা 'বোকা ছেলে' কথাটা ব'লে ফেললেন, তখনি রঙ্গন টুক ক'রে বুঝে নিলো যে আপাতত আর খাবার নিয়ে তাকে পীড়াপীড়ি করা হবে না। এক ঢোঁকে বাকি চা-টুকু গলায় ঢেলে দিয়ে সে উঠে পড়লো তাড়াতাড়ি ক'রে। বেলুনকে গিয়ে এবার জগৎ-সংসারের সব হালচাল খুলে বলতে হবে।

একবার নয়, দু-বার নয়, যাবার আগে রঙ্গন পই-পই ক'রে বেলুনকে ব'লে গেলো, 'ছাখো বেলুন, লক্ষ্মী বেলুন, সোনা তো, শান্ত হ'য়ে থেকো কিন্তু, শোরগোল কোরো না, লক্ষ্মীটি! দুষ্টুমি কোরো না, কোনো কিছু ভেঙো না, আর সাবধান, ককখনো বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ো না।'

তার এত সব ভারিক্কিমতো উপদেশ শুনে বেলুন গুম হ'য়ে থাকলো। রঙ্গন বুঝতে পারলো যে বেলুনকে নিয়ে যাবে না বলায় সে এই রকম রাগ ক'রে বসেছে। তাই রাগ ভাঙাবার জন্যে তাকে বলতে হ'লো, 'লক্ষ্মী, সোনা তো, অমন রাগ ক'রে থেকো না। আমার কী দোষ, বলো! মা তো নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে, আর মা-মনি যদি তোমাকে দেখতে পান আমার সঙ্গে, তাহ'লে কী মুশকিলে পড়বো, তা তো

বুঝতেই পারছো। কাজেই অমন অলুক্ষুণে আব্দার আর কোরো না। বরং আমি ফিরে আসি, তারপর তোমাকে নিয়ে আবার বেরোবো। কী? আবার কী হ'লো? তবু এত রাগ? বললামই তো পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো, তবু বাবুর রাগ পড়ে না। অমন করলে আর আমি কী করতে পারি! বেশ, তবে মাঝখান থেকে আমার যাওয়া বন্ধ হোক—মাকে গিয়ে বলি যে, আমার শরীর কেমন করছে, ভালো লাগছে না যেতে। তাতে লাভের মধ্যে অবশ্য এই হবে যে, মাও বেরুবে না বাড়ি ছেড়ে, খোলামকুচির মতো কিছু টাকা নষ্ট হবে ডাক্তার-বদ্যি ডেকে, আর আমাকে যে কত দিন ঘরে গ্রেপ্তার হ'য়ে থাকতে হবে, তা শুধু ভগবান জানেন। তুমি বুঝি তাই হ'লেই খুশি হও? তা যদি হও তো বলি মাকে! ভেবে দেখো কিন্তু ভালো ক'রে?'

শরীরকে নানাভাবে নাড়িয়ে বারণ করার ভঙ্গি করলে বেলুন।

'কী? তাতে রাজি নও তুমি? বেশ বলো তবে আমি কী করবো? যাবো মায়ের সঙ্গে? তুমি বেরোবে না তো বাড়ি ছেড়ে? গণ্ডগোল করবে না তো? দুষ্টুমি, শোরগোল, হৈ-হল্লা? বাঃ, এই তো বেশ লক্ষ্মী ছেলের মতো—না তো, লক্ষ্মী বেলুনের মতো কথা। রাগ করলে না তো? দেখো, আমি চট ক'রে ফিরে আসবো। তারপর তো আস্ত দিনটাই থেকে যাবে আমাদের দখলে। তখন কত জায়গায় যে ঘুরে বেড়াবো, দেখো! কী খুশি তো? না কি এখনো আর রাগ আছে? নেই তো? এই তো বেশ বেলুন, এই জন্যেই—জানো—তোমাকে আমার এত ভালো লাগে।'

রঙ্গন যখন এইসব কথা বললো, তখন তার কথার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে চড়ুইরা কিচিরমিচির শুরু ক'রে দিলো ঘরের ভিতর। জানলার পাশে, ঘুলঘুলির ভিতর, নানা খোপের মধ্যে বাসা বেঁধেছে তারা—লেবুগাছের

ঘন সুগন্ধের মতো ধীরে-ধীরে যখন সকাল ছড়িয়ে পড়ে আকাশ জুড়ে, তখুনি ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে তারা, কলরোল আর কিচিরমিচিরে ভরিয়ে দেয় সব। রঙ্গন যে-সব কথা বললো, সব যেন এখন চড়ুইগিন্নি তার ছোট্ট শাবকদের অনুবাদ ক'রে-ক'রে ব'লে দিতে লাগলো। তারা আবার মানুষের ভাষা খুব ভালো বোঝে; আস্তানাগুলো সবই তো মানুষদের সঙ্গে কিনা তাই—সব কুঠি, বাড়ি, ঘর, দোরে খোপখাপ ঘুলঘুলি দেখলেই তারা সেখানে গিয়ে খড়কুটো পাতা দিয়ে বাসা বানিয়ে নেয়। সেই জন্যে একদিন এক শালিকপাখি আবার রাগ ক'রে ব'লে উঠেছিলো—'তোমাদের কথা আবার ধরতে হয় নাকি?' হলুদ ঠোঁট সে বাঁকিয়ে নিয়েছিলো কথা বলতে-বলতে, 'থাকো তো মানুষদের সঙ্গে—তার আবার এতসব লম্বা-চওড়া কথা! পাখিজন্ম তোমাদের মিথ্যেই হ'লো—তোমরা না-মানুষ, না-পাখি।' তা এই কথা শুনে এক বুড়ো চড়ুই ব'লে উঠলো, 'তাহ'লে আমরা পানুষ বলো—পাখি আর মানুষের মিশোল।' সে আবার সুকুমার রায় ব'লে একজন কবির বাড়িতে আদ্ধেক জীবন কাটিয়েছে, তাই তাঁর মতো দুটো-তিনটে শব্দ জুড়ে-জুড়ে জোরঙ্গ-শব্দ বানিয়ে সে কথা ব'লে থাকে। 'ঐ তো!' অমনি চট ক'রে শালিকপাখিটি ব'লে উঠেছিলো, 'ঐ জোরঙ্গ-শব্দ বানিয়েই তুমি প্রমাণ ক'রে দিলে কী পরিমাণ নষ্ট হ'য়ে গেছো তুমি—পাখিত্ব হারিয়ে একেবারে মানুষ যেন। ছী-ছি-ছি, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত ছিলো—নিদেন একটা কথা তো মানো, যার নাম ঐতিহ্য—ওইটেই হ'লো আসৎ জিনিশ; ওই ঐতিহ্য হারালেই সর্বনাশ! তাছাড়া এভাবে পরের বুলি আউড়ে যে কী সুখ পাও, তা আমি বুঝি না।' তা, এখন চড়ুই-গিন্নি তার ছানাদের যে রঙ্গনের কথাগুলো তর্জমা ক'রে ব'লে দিলে, তার কারণই হ'লো ছানারা সবাই কিচির-মিচির ক'রে বায়নাক্কা

ধরেছিলো আজ মস্ত এক চড়ুইভাতিতে বেরোবে ব'লে, এদিকে চড়ুই-গিন্নির আবার পক্ষিনী আত্মরক্ষা সমিতিতে আজ বক্তৃতা দেবার কথা, তাই সে তাদের থামাবার জন্যে এইসব কথা না-ব'লে পারলে না।

আসলে এই গোটা ব্যাপারটাই রঙ্গনের বানানো। তার কথা শুনে বেলুন যখন গুম হ'য়ে ব'সে থাকলো, তখন তাকে বাধ্য হ'য়েই এইসব মন-গড়া কথা বানিয়ে ব'লে দিতে হ'লো। যা ভেবেছিলো, তা-ই হ'লো—এইসব শুনে বেলুন তো একেবারে হেসে কুটিপাটি—গড়িয়ে-গড়িয়ে বার-তিনেক ডিগবাজিই সে খেয়ে নিলে মেঝেয়, আর তা-ই দেখে রঙ্গনও খুশি হ'য়ে বললো, 'এবার তাহ'লে চলি। চট ক'রে ফিরে আসবো, দেখো। যা-যা বলেছি, সব মনে থাকবে তো!'

'থাকবে গো, থাকবে!' এই রকম এক ভঙ্গি ক'রে বেলুন তিনবার গড়িয়ে নিলো: আহ্লাদে অবশ্য ফেটে গিয়ে তখনো আটখানা হ'লো না, তবে তার ভঙ্গিটাই ব'লে দিলে যে, রঙ্গন যদি আরো খানিক এই ধরনের কথাবার্তা বলে, তাহ'লে অবশ্য সেই বিষম দুর্বিপাকটা হ'তে বেশি দেরি থাকবে না।

৭

রঙ্গন তো তারপর সাজগোজ ক'রে দিব্যি নিশ্চিন্তভাবে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো মায়ের সঙ্গে, ভুলেও একবারও ভাবতে পারলো না যে বেলুনের মগজে তখন কী-সব মতলব খেলে বেড়াচ্ছে। বাস-স্টপে গিয়ে দাঁড়াতেই হালুম বাঘের হাঁ-আঁকা মস্ত এক নীল রঙের দোতলা বাস এসে হাজির, আপিশ যাবার দিন নয় ব'লে বেশ ফাঁকা তখন; মায়ের সঙ্গে বাসে উঠতে-উঠতে রঙ্গন বললে, 'দোতলায় গিয়ে বসতে হবে কিন্তু মা, জানলার ধারে।' বাসের ঐ একরত্তি জানলাটুকু দিয়ে যখন খোলা হাওয়া আসে, আর যখন দেখা যায় বাড়ি-ঘর লোকজন ল্যাম্পোস্ট ট্র্যাফিকপুলিশ সব হু-হু ক'রে পিছনে ছুটে যাচ্ছে, তখন ভারি ভালো লাগে রঙ্গনের। মা হেসে বললেন, 'আচ্ছা, তা-ই হবে,' ব'লে হাতল ধ'রে-ধ'রে ছোটো সিঁড়িগুলো দিয়ে তিনি উপরের তলায় উঠলেন; রঙ্গনও পায়ে-পায়ে তাঁকে অনুসরণ করলো।

রঙ্গন আর তার মা সেই বাঘ-মার্কা দোতলা বাসের উপর-তলায় বসেছে কি না-বসেছে, এমন সময় মূর্তিমান সেই পেট-ফোলা লাল বেলুন দেখা দিলো বাসে; প্রথমে জানলার বাইরে সে কয়েকবার ডিগবাজি খেয়ে নানারকম কশরৎ করলে, তারপর রঙ্গনের দিকে তাকিয়ে ফূর্তির চোটে দু-বার ভেংচি কাটলো, এবং শেষকালে নবাবি চালে হেলেদুলে জানলা দিয়ে সোজা ঢুকে পড়লো ভিতরে। রঙ্গন নানাভাবে

তাকে ইশারা-ইঙ্গিতে বারণ করবার চেষ্টা করলো, কিন্তু বেলুন তা শুনলে তো! কোনো দিকে দৃকপাত না-ক'রে, কোনো কিছুর তোয়াক্কা না-রেখে দিব্যি সে ভিতরে ঢুকে রঙ্গনের ঠিক পাশের আসনে গিয়ে হাজির; ওখানেই সে বসতো নির্ঘাৎ, কিন্তু রঙ্গনের মুখচোখের করুণ চেহারা দেখেই তার সেই মহৎ ইচ্ছেটা মুহূর্তে উবে গেলো। সে যেন রঙ্গনকে চোখেই ছাখে নি, এই রকম এক ভঙ্গি ক'রে হাওয়ায় ভেসে-ভেসে বাসের সামনের দিকে চ'লে এলো; এমন ভাবে চারদিকে তাকাতে লাগলো যেন সে নিরীক্ষণ করতে বেরিয়েছে সব কিছু, এইভাবে টহল দিয়ে বেড়ানোই যেন তার পেশা। সেই সঙ্গে আরেকটা ভঙ্গিও বেশ রপ্ত ক'রে ফেললে সে—যেন এভাবে রোঁদে বেরোতে তার মোটেই

ইচ্ছে ছিলো না; কিন্তু কী আর করা যায়, কর্তব্য ব'লে তো একটা কথা আছে।

তার রকমশকম এবং ক্রিয়াকলাপ দেখে রঙ্গনের তখন হ'য়ে গেছে। মায়ের মুখের দিকে তাকাবার সাহসটুকু পর্যন্ত তার ছিলো না, কেবল কোনো রকমে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাস্তার দিকেই তাকিয়ে থাকলো সে অভিনিবেশ সহকারে; এমন একটা ভঙ্গি করলো যে বেলুনটি যে বাসে এসে উঠেছে, সে যেন তা খেয়ালই করে নি।

তা, কোনো নিয়ম-কানুন না-থাকলে বেলুন আর রঙ্গন এ-রকমভাবে একে-অন্যকে অচেনার ভান করলেই হয়তো ব্যাপারটা চুকে-বুকে যেতো। কিন্তু তোমরা তো জানো, বাসের ভিতরে গ্যাস-দিয়ে-ফোলানো কোনো বেলুন নিয়ে যেতে নেই—রঙ্গনকে এই কথাটা একবার বলেছিলো কণ্ডাক্টর। বেলুনটাকে দেখেই তো তারা হৈ-হৈ ক'রে ছুটে এলো। তারপর আর কী? হেডমাস্টারমশাইকে যে-ভাবে নাকাল করেছিলো, তাদেরও ঠিক তেমনিভাবে নাজেহাল ক'রে একেবারে হিমশিম খাইয়ে দিলো বেলুন। তিড়িং-তিড়িং লাফঝাঁপ, হৈ-হল্লা, চ্যাঁচামেচি, শোরগোল—সে প্রায় এক কিষ্কিন্ধা কাণ্ডের নতুন সংস্করণ আর-কি! শুধু তাই নয়, কণ্ডাক্টররা যখন বেলুনটাকে পাকড়াও করবার জন্যে লাফালাফি করছে, ঘণ্টা বাজছে না ব'লে ড্রাইভারও দিব্য মজা পেয়ে গেলো; তার আর ফুর্তি ভাখে কে—আজ দেখুক কলকাতা শহর, কী তাড়াতাড়ি সে বাস নিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যেতে পারে: এমনি এক কারদানি দেখাবার সংকল্প ক'রে সে জোরে ছুটিয়ে দিলো গাড়ি, কোনো স্টপেই আর গাড়ি থামালো না; 'আমার আর কী দোষ,' মনে-মনে সে নিজেকে ব'লে নিলে, 'কণ্ডাক্টররা যদি কোনো নির্দেশ না-দেয়, আমার তো আর কোথাও গাড়ি থামাবার

অধিকার নেই।' তাতেও না-হয় একরকম চলতো, যদি গাড়িগুলোয় একেবারেই লোক না-থাকতো। কিন্তু কোনো বাসকে যথেষ্ট ফাঁকা বলার মানে হ'লো একশো লোক দাঁড়িয়ে নেই, আর পাঁচশো লোক ঝুলে নেই: ঠিক অতটা অবশ্য না, এটা আবার একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেলো—কিন্তু একদিক থেকে এই সংখ্যাগুলোও নির্ভুল; কেননা গাজাগাজি ঠাশাঠাশি ভিড়ের মধ্যে—যেখানে মানুষের মাথা মানুষে খায়, সেখানে—গোনাগুনতির কী আর কোনো সুযোগ থাকে। তাই ফাঁকা বলতে এটাই বোঝা যায় যে বসার আসনগুলোয় লোকজন ভর্তিই আছে। এখন, এই বাসের ভিতর অন্য যে-সব লোকজন ছিলো, তারা যখন দেখলো যে একের পর এক স্টপগুলো নির্বিকারে ও নিশ্চিন্তভাবে পেরিয়ে যাচ্ছে বাসটা, তখন তারা দস্তুরমতো চ্যাচামেচি শুরু ক'রে দিলো: 'কী মশাই, ঘণ্টাটা দেবেন দয়া ক'রে? তিনটে স্টপ পেরিয়ে গেলো হ্যাখ-হ্যাখ ক'রে! কোথায় বিডন স্ট্রিটের মোড়ে নামবো, না কলেজ স্ট্রিট এসে গেলো প্রায়! বেলুন নিয়ে যদি খেলা করতেই হয় এই বুড়ো বয়েসে, তাহ'লে বাড়ি ব'সে করলেই পারেন, ঐ খাকি কুর্তা প'রে বাসের কণ্ডাক্টরি আর করা কেন তবে?' ইত্যাদি নানা কথা শুরু হ'য়ে গেলো বাসের বিভিন্ন কোণে। শুধু তাই নয়, রোববার তো সেদিন, লাল তারিখ ব'লে অনেকে ছোটোদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন—কেউ যাবেন চিড়িয়াখানায়, কেউ-বা জাদুঘর কি শিল্পীদের প্রদর্শনীতে, অনেকে আবার রবীন্দ্র-সরোবরের ধারে গিয়ে চড়ুইভাতি করার মতলব করেছিলেন। এখন, বাসভর্তি সেই সব ছোটো ছেলেমেয়েরা কিন্তু হাততালি দিয়ে চ্যাচামেচি ক'রে খুব জোর সমর্থন দিলে বেলুনকে, উৎসাহ দিয়ে বললে, 'শাবাশ বেলুন, শাবাশ! সামনে চলো, বাশ—বহুত আচ্ছা, এবার পাশ কাটিয়ে, হ্যাঁ,

হ্যাঁ, ঠিক হ্যায়, আবার পাশ কাটিয়ে--ওই যে, কণ্ডাক্টর এলো!' কেউ কেউ তো বায়নাক্কা ধরলে সেখানেই বাসের ভিতর বেলুনের সঙ্গে চোর-চোর খেলবে, কারো-কারো আব্দার আবার অন্য দিকে গেলো. 'আমার একটাও বেলুন নেই, একটা লাল বেলুন দিতেই হবে আমাকে, এক্ষুনি একটা গ্যাস-বেলুন চাই আমার,' ইত্যাদি। কাজেই, তোমরা তো সহজেই আন্দাজ ক'রে নিতে পারছো, কী তুমুল কাণ্ড তখন চলছিলো ওই বাসটার ভিতরে।

কতক্ষণ যে এ-ভাবে চলতো তাঁর ঠিক নেই, কিন্তু কাণ্ড দেখে রঙ্গনের মা-মনি ক্রমশ গম্ভীর হ'য়ে উঠলেন। আষাঢ় মাসের মেঘলা দিনের মতো ভারি, কালো, গভীর গলায় রঙ্গনকে তিনি জিগেস করলেন, 'সেদিনকার সেই বেলুনটা, না? আমি না সেটাকে জানলা দিয়ে বের ক'রে দিয়েছিলাম, তারপর আবার পেলি কী ক'রে?'

মায়ের গলা শুনেই রঙ্গন চট ক'রে বুঝে নিলে কী ভীষণ রাগ করেছেন তিনি। যখনি তাঁর গলার স্বর এই রকম হ'য়ে যায়, তখনি রঙ্গন ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে যায়—নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একটা শামুক যেমন তার শুঁড়সুদ্ধু খোলার ভিতর গুটিয়ে যায়, তারও তখন নিজের ভিতরে শেঁধিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। গলার কাছটা তার তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে গেলো, কয়েকবার ঢোঁক গিলেও কিছুতেই কোনো স্বর বের করতে পারলো না। মুখ কালো ক'রে সে মাথা ঝুঁকিয়ে ব'সে থাকলো —চোখ তুলে যে তাঁর দিকে তাকাবে, সেই সাহসটুকু পর্যন্ত তার হ'লো না।

'নিশ্চয়ই ফের তুই বেলুনটাকে আদর ক'রে নিয়ে এসেছিস!'

রঙ্গন কোনো মতে শুধু ঘাড় কাৎ ক'রে সায় দিলে, আর-কিছুই বললে না।

মা-মনি বললেন, 'রঙ্গন, তুমি এখুনি তোমার বেলুনকে নিয়ে বাস থেকে নেমে যাও! দেখছো, তোমার জন্যে এঁদের কী-রকম অসুবিধে হচ্ছে! এখন আর তোমাকে মাসিমনির বাড়ি যেতে হবে না। আমি কণ্ডাক্টরকে ব'লে এক্ষুনি বাস থামাবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।'

কথার ভঙ্গি থেকেই রঙ্গন বুঝতে পারলে যে, এখানে আর কোনো রকম আবেদন-নিবেদনই চলবে না। প্রথমটায় তার রাগ হ'লো বেলুন-টারই উপর। নাঃ, কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়! কাণ্ডজ্ঞান ব'লে যদি কিছু থাকে বেলুনটার! এত ক'রে সোনা-লক্ষ্মী ব'লে বুঝিয়ে এলাম, অথচ তার ফল হ'লো কি না এই! কিন্তু পরক্ষণেই বেলুনের ভবিষ্যৎ ভেবে সে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়লো। বাড়ি ফিরে মা আর কিছুতেই বেলুনটিকে আস্ত রাখবেন না। যে-রকম ঠাণ্ডাভাবে কথা ক'টি বললেন, আর যেমন কটমট ক'রে তাকালেন বেলুনটার দিকে, তাতে বেলুনের সর্বনেশে ভবিষ্যতের কথা আর বিশদ ক'রে কাউকে বলতে হয় না।

এদিকে মা-মনি তখন কণ্ডাক্টরকে ব'লে গাড়ি থামিয়ে দিয়েছেন। কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রে রঙ্গন তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর বেলুনকে ডাক দিয়ে রাগি গলায় ব'লে উঠলো, 'বেলুন, তুমি চ'লে এসো আমার সঙ্গে। আমি এক্ষুনি বাস থেকে নেমে যাচ্ছি।'

যেই না এ-কথা শোনা, অমনি বেলুন তিড়িং-তিড়িং ক'রে তিন লাফ দিয়ে রঙ্গনের হাতের কাছে এসে সার্কাসের ভ্যাবাগঙ্গারাম ভাঁড়ের মতো বোকা-বোকা ভাবে দাঁড়ালো। কোনো কথা না-ব'লে রঙ্গন তাকে নিয়ে আস্তে-ধীরে বাস থেকে নেমে গেলো। 'এবার ধমকে গালাগাল দিয়ে সব ভূত ভাগিয়ে দেবো,' এটাই সে মনে-মনে ভাবলো।

৮

সকাল থেকেই দিনটা ক'রে ছিলো মেঘলা। শুধু ছিলো মেঘ, অঙ্গারের মতো পোড়া রং তার, পাৎলা, ধোঁয়াটে, কালো কুয়াশায় ঢাকা। আর তারই আড়াল থেকে সূর্য পাঠিয়ে দিয়েছিলো তার ঝাপশা রশ্মিদের; গোল, মস্ত, ঘুরতে-থাকা লাট্টুর মতো ঝুলে আছে যেন সূর্যটা—বাসের জানলা থেকে দেখে এই রকমই মনে হয়েছিলো রঙ্গনের, রোজ যাকে ছাখে, প্রতিদিন যে ছড়িয়ে দেয় তাপ আর আলো আর দীপ্তি—মোটেই যেন তার মতো নয়, বরং তার কোনো এক বাজে, বিশ্রী আর ম্রিয়মাণ অনুকরণ যেন, কোনো আভা নেই, দীপ্তি নেই, প্রভা নেই—বরং যেন কোনো-এক ম্লান নকল তার—বল্বের মতো ঝুলে আছে। কিন্তু যেই রঙ্গন বাস থেকে পায়ে-পায়ে নেমে এলো, হাতের মুঠোয় বেলুনের সুতোটা আঁটো ক'রে ধ'রে, অমনি যেন কোন দূরের থেকে জোর এক হাওয়া দিলো, ব'য়ে গেলো অধীর এক সমীরণ, অনিলে-পবনে কোনো আলোর বাগানের পরিমল ছড়িয়ে গেলো যেন, আর তক্ষুনি কেঁপে-কেঁপে স'রে গেলো সেই ছায়ার পর্দা, যে তার মেঘলা যবনিকার আড়ালে এতক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিলো সব আলো আর তাপ আর বিভা।

বেলুনের গায়ে রশ্মি এসে পড়লো দিগন্ত থেকে, আর আলতো হাওয়ায় কেঁপে-কেঁপে উঠলো সে তার ঝলমলে শরীর নিয়ে, আর তারই জন্য কিছুই তাকে বলতে পারলো না রঙ্গন, শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে

তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো সেই মস্ত নীল বাঘমার্কা বাসটা তক্ষুনি আবার ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে মাকে নিয়ে চ'লে গেলো মাসিমনির বাড়ির দিকে।

মস্ত একটা কাঠের খুঁটি উঠেছে রঙ্গনের পাশেই ; সেই ঢ্যাঙা খুঁটির মাথায় চৌকো একটা টিনের পাত, শাদার উপর তাতে গোল ক'রে লাল একটা বৃত্ত আঁকা, আর সেই বৃত্তের উপর দিয়েই বড়ো-বড়ো হরফে 'বাস-স্টপ' কথাটা লেখা। আলো প'ড়ে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে সেই শাদা আর লাল রং। বাস চ'লে গেলো দূরে, ঝাপশা মিলিয়ে গেলো সেখানে যেখানে আর চোখ পৌঁছোয় না, ঢং-ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজিয়ে চ'লে গেলো একটা-দুটো ট্র্যাম, আর এক ভদ্রলোক রঙ্গনের পিছন থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে গিয়ে ট্র্যামের হাতল ধ'রে লাফিয়ে উঠলেন তাতে, তারপর আরেকটা বাঘ-আঁকা বাস গেলো পিছনে-পিছনে ভেঁপু বাজাতে-বাজাতে। সব রঙ্গন দেখলো অপলকে, আর তারপর হঠাৎ তার চোখ পড়লো বাস-স্টপের খুঁটিতে।

ফোলা, মোটা মস্ত এক শুঁয়োপোকা বুক দিয়ে জড়িয়ে আছে সেই বাস-স্টপের খুঁটি—রঙ্গন দেখলো ঢেউ খেলে যায় তার গোটা শরীরে, স্রোতের মতো কেঁপে-কেঁপে যায় সে, যখন সে বুকে হেঁটে উপরে ওঠে। বুক দিয়ে সে জড়িয়ে আছে খুঁটি, আশ্চর্য—প'ড়ে যাচ্ছে না কিছুতেই, প'ড়ে ম'রে যাচ্ছে না। আস্তে-আস্তে সে উঠতে থাকলো ঐ খুঁটি বেয়ে, অঙ্কের সেই অধ্যবসায়ী চিনে জোঁকের মতো—যে পিছলে প'ড়েও কিছুতেই হাল ছাড়ে না, শেষ পর্যন্ত সব ছেলের কাছে বিভীষিকা হ'য়ে ডগায় পৌঁছে যায়—তারই মতো অবশেষে সে উঠে এলো খুঁটির ডগায়, আর তক্ষুনি সেই অবাক ব্যাপারটা ঘ'টে গেলো, যার কথা বিজ্ঞানের ক্লাশে সে শুনেছে মাস্টারমশাইয়ের কাছে, কিন্তু কখনো যা চোখে ছাখেনি এর আগে। দেখলো হঠাৎ তখন আবার হাওয়া

দিলো দিগন্তের ডালেপালায়, আর অমনি ঝ'রে গেলো সেই শুঁয়ো-পোকার খোলশ, তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো রঙিন এক প্রজাপতি, পাৎলা তার ছোট্ট পাখায় ফুলঝুরির মতো জ্ব'লে উঠেছে সাত রং, হালকা ঐ খুঁটিটাকে ঘিরে উড়লো সে খানিক, তারপর উড়ে এসে বসলো বেলুনের পাৎলা শরীরে ; বেলুন কাঁপলো হাওয়ার ঢেউয়ে, সেও কাঁপলো, যেন এক ঝলমলে তারাবাতি, শেষকালে, খানিক বাদে, আবার সে উড়ে গেলো খুঁটির ডগায়—একবার ঘুরলো খুঁটিটার চারপাশ, তারপর উড়ে গেলো দূরের দিকে, যে-দিক দিয়ে মা-মনিকে নিয়ে বাসটা চ'লে গেলো।

প্রজাপতিটা যেই উড়ে গিয়ে দূরে মিলিয়ে গেলো, অমনি হঠাৎ রঙ্গন যেন তার বোধশক্তি ফিরে পেলো। এতক্ষণ ধ'রে সে কেবল অপলক চোখে তাকিয়ে দেখছিলো সব, কথা বলার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত ছিলো না ; এখন হঠাৎ আবার সব ক্ষমতা সে ফিরে পেলো। এবং তার প্রথম খেয়াল হ'লো যে, এখান থেকে তাদের বাড়িটা নেহাৎ কম দূরে নয় ; তাছাড়া বেলুন সঙ্গে আছে ব'লে আর-কোনো বাসেই ওঠা যাবে না। অন্তত রঙ্গনের সেই সাহস হ'লো না। কাল ইশকুলে যাবার সময় প্রথমটায় বেশ কথা শুনেছিলো বেলুন—যেমন বলেছিলো, তেমনিভাবে উড়ে-উড়ে গিয়েছিলো চলতি বাসের পিছন-পিছন। কিন্তু আজ সকাল থেকেই শ্রীমানের মর্জি হয়েছে কোনো কথাই শুনবেন না এই লাল তারিখে, আর সেই জন্যই এই ঝামেলায় পড়তে হ'লো তাকে। অনেক বকুনি সে শান দিয়ে রেখেছিলো জিভের ডগায়, কিন্তু কোনোটাই আর এখন তার ব্যবহার করতে ইচ্ছে হ'লো না। আলো প'ড়ে কেমন টুকটুকে হ'য়ে উঠেছে বেলুনের পাৎলা শরীর, আশপাশে সে যেন এক রঙিন আভা ছড়িয়ে

দিচ্ছে, যেমনভাবে ঠাণ্ডা রঙিন আলোর বল থেকে উপচে পড়ে জ্বলজ্বলে রং।

'হেঁটেই আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে,' রঙ্গন বললে বেলুনকে, 'তোমার জন্যেই এমনটা হ'লো, বুঝতে পারলে তো? আর পারা গেলো না তোমাকে নিয়ে—কাজেই চলো, বাড়ির দিকে হণ্টন দিই এবার। না, না, খুব হয়েছে, আর তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে না, সব আমি বুঝেছি। এখন এক নম্বর সমস্যা হ'লো কত তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছোনো যায়। আর দুই নম্বরটা কী, বলো তো? পারলে না তো? শোনো, যেতে-যেতে তোমাকে বলছি। মা-মনি যে কী ভীষণ রাগ করেছেন, তা নিশ্চয়ই তুমি আঁচ করতে পেরেছো। এখন কথা হ'লো, বাড়ি ফিরেই তিনি হয়তো তোমাকে তাড়াবার ব্যবস্থা করবেন: সে-রকম কোনো দুর্দিন যাতে না আসে, এখন আমাদের সেই কথাই ভাবতে হবে, বুঝেছো। অবশ্যই এই বিভীষণ ঝামেলাটির জন্যে আমি দায়ী নই, নিয়মমতো তোমারই উচিত এই সমস্যার সমাধান করা, কেননা আমি তোমাকে পই-পই ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছিলুম আমাদের সঙ্গে আসতে। এখন, যেমন কর্ম, তেমনি ফল ভোগ করো—আমি কিন্তু কিস্সুটি জানিনা, এই তোমাকে আগেই ব'লেই রাখছি।'

বেলুন নেচে-টেচে এমন এক ভঙ্গি করলো, যার মানে দাঁড়ায়, 'দিনটা কী-রকম সুন্দর হয়েছে, দেখেছো রঙ্গন? এখন কি আর ঐ সব বিশ্রী ভাবনাগুলো ভেবে মন খারাপ করতে আছে? তার চেয়ে চলো, দিব্যি ফুর্তি ক'রে বেড়াতে-বেড়াতে বাড়ি যাই—পরে কী হবে, বরাতে কী আছে—এই সব ভারি-ভারি ব্যাপার না-হয় পরেই ভাবা যাবে।'

'না, না, তুমি বুঝতে পারছো না, বেলুন। মা-মনির রাগকে তুমি যতটা সহজ ভেবেছো, তা কিন্তু মোটেই সে-রকম নয়। এই

গণ্ডগোলটা যেমন পাকিয়ে বসেছো, তেমনি তার জট খোলার ভারও তোমার উপর—এই আমি ব'লে রাখলাম। তখন কিন্তু আমি তোমায় কিছুই সাহায্য করতে পারবো না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে-সব কথা না-হয় পরে ভাবা যাবে। এখন তো ফুর্তিটুকু ক'রে নিই। যখনকার যা, তখনকার তা। তোমরা মানুষেরা সব সময়েই কেবল পরে কী হবে, এই কথা ভেবে-ভেবে অন্য সময়টুকুও নষ্ট ক'রে দাও। সেটা আমার মোটেই পছন্দ নয়।' বেলুন তো আর কথা বলতে পারে না, তাই কথাগুলো সে বললোই না, কিন্তু তার ভঙ্গি থেকেই এই অর্থটা বের ক'রে নিলে রঙ্গন। কাজেই কী আর করে—চললো সে বেলুনকে নিয়ে অ্যাসফল্টের মস্ত রাস্তা ধ'রে।

বেলুনও চললো সঙ্গে-সঙ্গে আগের মতোই লাফঝাঁপ আর ডিগবাজি খেতে-খেতে, ফুর্তির পরিমাণটা যেন তার আগের চেয়েও অনেক বেশি। রঙ্গনকে বাস থেকে নামিয়ে এনে নিজের সঙ্গী ক'রে নিতে পেরেছে—এই কথা ভেবেই বোধ হয় তার খুশি একেবারে উথলে উঠেছে। পরে কী হবে না-হবে, তার কোনোই পরোয়া করে না সে। এই মুহূর্তে তো দু'জনে একসঙ্গে আছি—এটাই বা কোনো কম কথা হ'লো না কি? এটাও তো হ'তে পারতো যে মায়ের সঙ্গে রঙ্গন বাড়ি ফিরে এলে পর উজবুক কোনো অসতর্ক মুহূর্তে বেলুন তার চোখে প'ড়ে গেলো—আর অমনি তিনি রেগে তিনটে হ'য়ে ফের তাকে জানলা খুলে বাড়ি থেকে বের ক'রে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন। তখন তো বাপু মাঝের থেকে একূল ওকূল দুই কূলই হারিয়ে বসবে—সোনায় একেবারে ছিটেফোঁটা সোহাগা প'ড়ে যাবে যেন—তোমার সঙ্গে বাইরেও বেরোলুম না, অথচ ঘরেও তোমাকে কাছে পাওয়া গেলো

না। তার চেয়ে বরং এটাই অনেক ভালো হ'লো, অন্তত এই সময়টুকু তো একেবারে একলা ক'রে পেলাম তোমাকে—ইশকুলের ঝামেলা নেই, ঝক্কি নেই পড়া করার, অবসরেভরা আস্ত একটা দিন যেন ঠিক তোমার-আমার জন্যই তৈরি হয়েছিলো।

এই জাতীয় আরো অনেক কিছুই হয়তো ভাবতো বেলুন, কিন্তু হঠাৎ এমন সময় হৈ-হট্টগোল আর ডুগডুগির আওয়াজে রাস্তার চার পাশে হাওয়া যেন একেবারে অস্থির হ'য়ে গেলো। তাকিয়ে ছাখে, রাস্তার এক পাশে মস্ত এক ঠাশাঠাশি ভিড়—আর ভিড়ের ভিতরে আলখাল্লা-পরা এক দাড়িওলা বুড়োলোক ঘুরে-ঘুরে ডুগডুগি বাজাচ্ছে। অমনি কৌতূহলে তার ভিতরে যেন শুড়শুড়ি লেগে গেলো। তার উপর ডুগডুগির আওয়াজটাই এমন যে, শুনলেই যেন তালে-তালে নাচতে ইচ্ছে করে। কেমন যেন একটা ছটফটানি জাগিয়ে দেয় ভিতরে। তক্ষুনি চটপট সে চ'লে গেলো ভিড়ের দিকে, পিছনে রঙ্গন এলো কি না-এলো সেদিকে কোনো খেয়ালই রইলো না।

বেলুনের উত্তেজনা দেখে রঙ্গনও ছুটে এলো তার পিছন-পিছন। ব্যাপারটা কী, জানবার জন্যে তারও ভিতরটা উশখুশ করছিলো কৌতূহলে। কোনো কথা না-ব'লে ঠেলাঠেলি ক'রে দু-হাতে ধাক্কা দিয়ে তড়িঘড়ি সে ঢুকে পড়লো ভিড়ের ভিতর। তাকিয়ে দেখলো ডুগডুগি বাজাতে-বাজাতে ধুলোয় আসর সাজিয়ে পথের ধারে ব'সে পড়লো সেই বুড়ো। চোখ দুটি তার যেন কিসের নেশায় অস্থির হ'য়ে আছে—চটপট সে ভিড়ের উপর চোখ বুলিয়ে নিলো, তারপর হঠাৎ সেই রঙ্গনের উপর চোখ পড়লো অমনি তার চোখের তারা দুটি যেন ঝলমল ক'রে উঠলো মুহূর্তে। অমনি একটুখানি মুচকি হেসে যা-তা কত কিছু মন্ত্র বিড়বিড় ক'রে আউড়ে পথের ধুলোয় একটা চাদর মেলে দিলো সে

সন্তর্পণে। তারপর ডুমডুম ক'রে ডুগডুগি বাজিয়ে আরো কী-সব মন্ত্র আওড়ালো রুদ্ধশ্বাসে, আবার একবার রঙ্গন আর তার বেলুনের দিকে ঝলমলে চোখে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলো, আর শেষে সব মন্ত্র থামিয়ে তিনবার হাততালি দিয়ে উঠিয়ে নিলো কাপড়টা।

যেই-না উঠিয়ে নিলো, অমনি ধুলোর মাঝেই দেখা দিলো নানা জিনিশ। ছুটো বেগুন, একটা চড়ুইছানা—সে আবার চিঁ-চিঁ ক'রে তক্ষুনি উড়াল দিয়ে চ'লে গেলো ভিড় থেকে, জামের আঁঠি, ল্যাজঝোলা মস্ত একটা ছেঁড়া ঘুড়ি, গালার চুড়ি, গন্ধের ধোঁয়া-ওঠা ধুনুচি, চিনেমাটির ভাঙা বাসন—এমনি কত-কি! কোনো-কিছুর সঙ্গেই কোনো কিছুর যোগ নেই, কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই আগু-পিছুর, শুধুই সে ভোজবাজি দেখালো মুচকি হেসে।

দেখেই ভিড়ের লোক ব'লে উঠলো, 'শোবাশ, বহুৎ আচ্ছা। ফিন আউর এক খেল—'

মাথার শুঁড়-তোলা মস্ত টুপিটা খুলে ঘাড় নুইয়ে বুড়ো বললো, 'বহুৎ মেহেরবানি আপকো।' তারপর এক-একটা জিনিশ তুলে 'লাগ ভেলকি, লাগ' ব'লে ছুঁড়ে মারলে সে শূন্যে। অমনি দেখা গেলো বেগুন ছুটো বেগনি রঙের হালকা ছুটি পেট-ফোলা বেলুন হ'য়ে উড়ে গেলো শূন্যে; আকাশে ছুটো পালক ছিটিয়ে উড়াল দিয়ে উধাও হ'য়ে গেলো জামের আঁঠিটা—চোখের পলকে সে কিনা মস্ত এক হলদে পাখি হ'য়ে গিয়েছিলো। ঘুড়িটা চটপট উঠে গেলো সকলের নাগালের বাইরে, নীল শূন্যে—ইচ্ছে মতো গোঁত্তা খেলো বার-কয়েক, বোঁ-বোঁ ক'রে পাক খেয়ে ঘুরলো, তারপর মাথা-ভারি বেশামাল ঘুড়ির মতো টলোমলো করলো একটু, নিজেই মর্জিমাফিক ভোঁ-কাট্টা এক ঘুড়ি হ'য়ে খাবি খেতে খেতে উড়ে যেতে লাগলো দূরে। বাকি জিনিশগুলোও চুপচাপ

থাকলো না—কেউ হ'য়ে গেলো প্রজাপতি, কেউ-বা পাৎলা এক ফড়িং, বেশির ভাগই অবশ্য নানা জাতের পাখি হ'য়ে গিয়ে দূরে উড়ে গেলো।

সব দেখে-শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো রঙ্গন। কেন যেন গলার ভিতরটা তার শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেলো, আর বিষমভাবে ঢিপঢিপ ক'রে উঠলো বুকের ভিতর। গরম নিশ্বেস পড়লো দ্রুত, লাল হ'য়ে উঠলো চোখ-মুখ। তাড়াতাড়ি সে বেলুনের সুতো আঁকড়ে বললে, 'শিগগির চলো বেলুন, এখানে আমার একটুও ভালো লাগছে না। বড্ড ভয় করছে।'

প্রথমে কিছুতেই এখন যাবে না ব'লেই ঠিক করেছিলো বেলুন,—কিন্তু যেই শুনলো রঙ্গন ভয় পেয়ে গেছে, তখন কোনো কথা না ব'লে চ'লে এলো ভিড়ের ভিতর থেকে। তখনো সেই বুড়োর গলা শোনা যাচ্ছে দূর থেকে, 'লাগ ভেলকি, লাগ।'

কোনো-কথা না-ব'লে মোড় বেঁকে নতুন রাস্তায় এসে পড়লো রঙ্গন। আস্তে-আস্তে দূরে মিলিয়ে গেলো মন্ত্র-পড়া ডুগডুগির নেশা-ধরানো আওয়াজ।

কেন যে হঠাৎ ম্যাজিক দেখে তার এতটা ভয় ধ'রে গেলো, তা সে ভালো ক'রে বুঝতেই পারলো না। বাঘের মুখোমুখি হ'লে হরিণছানার সব বোধ লোপ পেয়ে গিয়ে যেমন ভয়ের ভাবটাই প্রবল হ'য়ে জেগে থাকে, ওই বুড়ো জাদুকরের চোখের দিকে তাকিয়ে তারও যেন ঠিক অমনি অবস্থা হয়েছিলো।

কিন্তু সে তো আর হরিণছানা নয়, আর ওই লোকটাও বাঘ নয়। তার উপর এখন তো দিনের বেলা ঝলমল করছে রোদ, আলতো হাওয়ায় কেঁপে-কেঁপে উঠছে গাছের পাতা; গাড়ির চাকার শব্দ, ট্র্যামের ঘুন্টির আওয়াজ, লোকজনের চ্যাঁচামেচি—সব আস্তে-আস্তে তার ভয়কে

দূরে সরিয়ে দিলো। আর তক্ষুনি হঠাৎ তার খেয়াল হ'লো যে কি-রকম যেন কাহিল লাগছে নিজেকে, যেন ভীষণ খিদেয় কাবু হ'য়ে গেছে হঠাৎ।

সকালে মোটেই ভালো ক'রে খায় নি রঙ্গন; ভেবেছিলো মাসি-মনির বাড়িতে বেশ মোটারকমের খাবার-টাবার হবে, এদিকে তার উপর বেলুনের জন্যও কিছুটা দুশ্চিন্তা ছিলো—সেই জন্যেই সে কম খেয়েছিলো তখন। এখন এতটা পথ হেঁটে ওর ভীষণ খিদে পেয়ে গেলো। পেটের ভিতরে যেন সাড়ে সাত হাজার ছুঁচো ঘুমিয়েছিলো এতক্ষণ, এবার আড়মোড়া ভেঙে তারা ভীষণ রকম ডন-বৈঠক শুরু ক'রে দিলো—অনেকেই আবার তারই সঙ্গে তাল রেখে শুরু করলো হেঁড়ে গলায় কীর্তনগান। তাছাড়া, পথে এতগুলো মিস্টির দোকান রয়েছে, কাজেই খিদেরই বা তেমন দোষ কী!

পকেটে হাত দিয়ে রঙ্গন নেড়ে-চেড়ে দেখে নিলে আস্ত একটা চকচকে রুপোর টাকা আছে। জলপানির পয়সা জমিয়ে-জমিয়ে এই চকচকে টাকাটা উপার্জন করেছে সে।

টাকাটা হাতের মুঠোয় নিয়ে সে দোকানে ঢুকলো, ঢোকবার আগে বেলুনকে ব'লে গেলো, 'বেলুন, এবারে একটু ভালো হ'য়ে থেকো কিন্তু, লক্ষ্মীটি তো। তোমার জন্যে এমনিতেই আমার হাড়মাস ভাজা-ভাজা হ'য়ে গেলো, তার উপর সব সময়েই যদি অবাধ্যতা করো, তাহ'লে আমি কিন্তু ভীষণ রেগে যাবো, জীবনে আর একটিও কথা বলবো না তোমার সঙ্গে। তখন কিন্তু আমাকে কোনো দোষ দিতে পারবে না। কেমন, মনে থাকবে তো? কোথাও যেয়ো না কিন্তু, এখানে অপেক্ষা করো। আমি এক্ষুনি আসছি—শুধু যাবো আর আসবো। কী, কথা মতো কাজ করবে তো, না কি আবারও অবাধ্যতা করবে?'

বেলুন ঘাড় কাৎ ক'রে, নিজেকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে এই কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করলো যে, 'তোমাকে আর শাসন করতে হবে না। এবার থেকে আমি নিজেই ভালো হবো ব'লে ঠিক করেছি। কিচ্ছুটি ভেবোনা তুমি। বেরিয়ে এসে ঠিক এখানেই আমাকে দেখতে পাবে, তোমার জন্যে হাওয়ায় ভেসে অপেক্ষা ক'রে আছি।'

৯

রঙ্গন আর-কোনো কথা না-ব'লে লোভনীয় ভাবে সাজানো-গুছনো মিস্টির দোকানটিতে গিয়ে ঢুকলো। একটুক্ষণ দোকানের বাইরে অপেক্ষা ক'রে থাকলো বেলুন, কিন্তু ওই ছায়ায় ঢাকা জায়গাটা তার আর বেশিক্ষণ ভালো লাগলো না। আয়েস ক'রে রোদ পোয়াবার জন্যে রাস্তার এক পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে রঙ্গনের জন্যে চুপটি ক'রে ভেসে থাকলো হাওয়ায়। দোকান থেকে সে-জায়গাটা বেশ কিছুটা দূরে।

আগের দিন যে-সব ভবঘুরে বোম্বেটেমার্কা রাস্তার ছেলে বেলুনটাকে তাড়া করেছিলো, তাদের তো সব তল্লাটেই গতিবিধি আছে। তাদেরই একজন বেলুনটিকে দেখে তক্ষুনি চারদিকে সবাইকে চট ক'রে খবর পাঠিয়ে দিলো যে সেই লাল রঙের বেলুনটাকে এবার হাতের মুঠোয় পাওয়া গেছে, কাজেই সব্বাই চটপট চ'লে এসো। অমনি কালো-কালো পিঁপড়ের মতো পিল-পিল ক'রে নানা গলিঘিঁজি আর বাঁকা রাস্তা, ছোটো রাস্তা, বড়ো রাস্তা থেকে ছেলের পাল বেরিয়ে এলো দঙ্গল বেঁধে। তারপর যেই তারা দেখলো বেলুন সেখানে একলাটি হাওয়ায় ভেসে রোদে লালরঙের ঝিলিক ছিটিয়ে দিচ্ছে, তক্ষুনি ফিশফিশ ক'রে কথা ব'লে সব আঁটঘাট বেঁধে মৎলব ঠিক ক'রে নিলে। সঙ্গে রঙ্গনকে

না-দেখে তারা ভাবলে, সোনালি সুযোগ যদি কিছুকে বলে তো সে হ'লো নির্ঘাৎ এই—এই মওকায় যদি বেলুনকে পাকড়াও করতে না-পারে, তাহ'লে তাদের দলের মান-সম্ভ্রম ব'লে কোনো পদার্থ ই আর থাকবে না। কাজেই পা-টিপে-টিপে সন্তর্পণে তারা এগিয়ে এলো চারপাশ থেকে, এমন এক ভঙ্গি করলো যেন তারা ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না, ঠিক যেন একেকজন ভ্যাবাগঙ্গারাম। তা, বেলুন তো আর ওদের খেয়াল করে নি, তাছাড়া অমনি সাধু চোখের ভঙ্গিমা দেখে সে-ই বা কী ক'রে বুঝবে যে, ওদের কেবল বদ রকমের মৎলব রয়েছে বা গন্ধ-লাগা মাছ ঢেকে আছে তারা শাক দিয়ে। সে তেমনি নির্বিকারে আয়েস ক'রে রোদ পোয়াতে-পোয়াতে চারপাশে লাল রঙের টুকরো-টুকরো রশ্মি ছিটিয়ে দিতে লাগলো। কাছে এসেই সেই বোম্বেটেগুলো করলে কি, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো বেলুনের উপর, আর সর্দারটি শক্ত মুঠোয় আঁটো ক'রে জড়িয়ে নিলে বেলুনের সুতো, তারপর যেই বুঝলে যে অনায়াসেই বেলুনকে পাকড়াও ক'রে নেয়া গেছে এবার, অমনি হৈ-রে-হৈ ক'রে দৌড়ুতে শুরু ক'রে দিলে। বেলুন বেচারা এতটাই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো যে প্রতিরোধ তো দূরের কথা কোনোরকম প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারলো না; সুযোগই পেলো না তার—এমনকি রঙ্গনকে কোনো খবর দেবার সময়টুকু পর্যন্ত পেলো না সে। যখন তার হতভম্ব অবস্থাটা অনেকটা কাটলো, তখন আর-কিছুরই কোনো সময় নেই।

রঙ্গন যখন মিস্টির দোকান থেকে বেরিয়ে এলো, তখন আশপাশে কোনোখানে বেলুনের 'ব'-টি পর্যন্ত নেই। নির্ঘাৎ আবারও দুষ্টুমি আরম্ভ ক'রে দিয়েছে বেলুন—এ-কথা ভেবেই ভীষণ রাগ হ'লো রঙ্গনের। 'এত ক'রে বললাম, তবু একবারও কথা শোনার বালাই নেই। অথচ এমন সব

ভঙ্গি করে যেন কত সে বাধ্য, একেবারে অনুগত বশম্বদটি! না, এবারে যদি ওকে কোনো শাস্তি না-দিই তো কী!' চারদিকে ঘুরে-ঘুরে দেখল রঙ্গন, তাকালো আকাশে, এদিকে, ওদিকে, সবখানে। দেখলো গাছের ডালপালার আড়ালে সে লুকিয়ে আছে কিনা; তাকালো ঢ্যাঙামতো ল্যাম্পোস্টগুলির দিকে; কিন্তু না, কোথাও নেই শ্রীমান, সুতোর ডগাটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কোথাও। আর পারা গেলো না ওকে নিয়ে, কোনো কথাই শুনবে না, ঠিক যেন এ-রকম একটা পণ ক'রে ব'সে আছে। যা বলবে, ঠিক তার উল্টোটাই করা চাই—না হ'লে যেন আর কিছুতেই নিজের মান থাকে না। আবারও অবাধ্যতা করেছে বেলুন, তার কথাকে কোনো দাম না-দিয়েই নিশ্চয়ই বেড়াতে বেরিয়েছে হতচ্ছাড়া।

গলা ফাটিয়ে ডাকলো সে চারপাশে, কিন্তু না, বেলুন আর ফিরে এলো না। একেবারে যেন উধাও হ'য়ে গেছে দিগন্ত পেরিয়ে। গলার শিরাগুলি তার ফুলে-ফুলে উঠলো ডাকার সময়, ফুলে চোখ আর টেরচাভাবে বেরিয়ে এলো গলার কণ্ঠা, কিন্তু কোনো পাত্তাই নেই বেলুনের। বড্ড বাড়াবাড়ি করছে বেলুনটা, মনে-মনে ভাবলে রঙ্গন। যদি একবার দেখতে পেতো, তাহ'লে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো একটু—কিন্তু একেবারে লোপাট হ'য়ে গেছে যেন এই তল্লাট থেকে। এবার রঙ্গনের একটু দুশ্চিন্তা হ'লো। কেউ জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যায় নি তো বেলুনকে? কাল তো এক দঙ্গল ছেলের লোভ ছিলো বেলুনের জন্য; তারা এসে নিয়ে গেলো না তো বেলুনকে? এই কথা ভাবতেই তার গলা শুকিয়ে গেলো, দুর্ভাবনায় ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো মুখটা, হ'য়ে গেলো একেবারে মলিন আর কালো, সব রাগটা গিয়ে পড়লো নিজের উপরেই। এত পেটুক সে যে বেলুনকে একা

রেখে কিনা মিস্টির দোকান দেখেই হনহন ক'রে ভিতরে ঢুকে পড়লো। রাগে, ক্ষোভে পারলে সে তখন মাথার চুল ছেঁড়ে। কী হবে তাহ'লে, যদি ওরা বেলুনকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে থাকে! কাড়াকাড়ি ক'রে ফাটিয়ে না দেয়? এর-ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে-নিতে শেষকালে নিশ্চয়ই বেলুনটা ফেটে যাবে! এই সম্ভাবনাটা মনে উঁকি দিয়ে যেতেই তার বুকটা দুরুদুরু ক'রে উঠলো।

রাস্তার সেই ছেলেগুলো তখন শক্ত মোটা মস্ত একটা সুতো দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে নিয়েছে বেলুনকে; একজন আবার কোত্থেকে এক লাটাই নিয়ে এলো সুতোজড়ানো. তারপর লাটাইয়ের সুতোর সঙ্গে শক্ত সেই বেলুনের সুতোটা বেঁধে দিয়ে উড়িয়ে দিলে তাকে আকাশে। একজন আবার বুদ্ধি দিলে, 'বুঝলি ভুতো, বেলুনটাকে নানারকম কায়দাকৌশল শেখাতে

হবে।' ভুতো হচ্ছে দলের সরদার, তক্ষুনি সে সায় দিলে তার সাঁকরেদের কথায়, 'নিশ্চয়ই শেখাতে হবে, সেই জন্যেই তো নিয়ে এলাম ওকে। আমার ইচ্ছে কী, জানিস? বেলুনটাকে মেলায় দেখাবো. দেখ'লে অনেক পয়সা পাওয়া যাবে। ঢাকঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেবো, ম্যাজিকের বেলুন—আশ্চয সব কশরৎ দেখাবে।' এই ব'লে ডিপহিপে একটি কঞ্চি তুলে নিলে সে হাতে, বেলুনকে ভয় দেখিয়ে বললে, 'এদিকে আয়, বেলুন, কথা শোন—নইলে তোকে ফাটিয়ে ফেলবো। হ্যা এই তো বেশ লক্ষ্মী ছেলের মতো ব্যাপার! শোন, অনেক উঁচুতে উঠতে হবে তোকে, যত উপরে উঠতে পারিস। আমি লাটাই ধ'রে আছি। খববদার, কোনো রকম পালাবার চেষ্টা করিস নে—তাহ'লে তোকে একেবারে ফুটো ক'রে দেবো—আর পেট থেকে সব হাওয়া ভুউশ ক'রে বেরিয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ একেবারে চুপশে মিইয়ে যাবি!'

এইসব বিভীষিকার কথা শুনে বেলুন তো ভয়েই আধমরা। কোনো রকমে ঘুরে-ঘুরে সে উঠতে লাগলো উপরে, ঘুরে-ঘুরে বেরিয়ে এলো লাটাইয়ের সুতো--কিছুতেই তা আর যেন ফুরোয় না।

মস্ত এক পাঁচতলা কোঠাবাড়ির ছাতের উপরে গোলমতো এক গম্বুজ উঠে গেছে, মিনারের মতো উঁচু: ঘুরে-ঘুরে লোহার কালো সিঁড়ি উঠেছে তাকে পেঁচিয়ে: সেই গম্বুজের মাথায় মস্ত এক ঘড়ি আছে অনেক দিনের পুরোনো—যেমন বড়ো সেই ঘড়ি, তেমনি বড়ো-বড়ো তার মিনিটের আর ঘণ্টার সরু কালো রোগা কাঁটা; অনেক দূর থেকেও দেখতে পাওয়া যেতো তাদের, আর ওই ঘড়ির ঘণ্টার আওয়াজও শোনা যেতো অনেক দূর থেকে। মস্ত এক লেবেল এঁটে রাখা ঘড়ির ঠিক নিচেয়—তাতে বড়ো-বড়ো হরফে লেখা: 'শুক্রবার'। ওই দিনেই সেই কালো সিঁড়ি বেয়ে ঘুরে-ঘুরে উঠে আসে ঘড়িবাবু, তারপর ঘড়ির ডালা

খুলে চাবি লাগিয়ে আবার সাত দিনের জন্য দম দিয়ে যায়। উড়তে-উড়তে বেলুন এসে পড়লো সেই ঘণ্টাঘরের দেয়ালের কাছে; তারপর কার্নিশ ছুঁয়ে আস্তে-আস্তে উঠে পড়লো একেবারে সেই ঘড়ির উপর। সেইখানে উঠে ঘড়ির কাঁটা বরাবর সে ভেসে থাকলো— আর এতক্ষণে সময় পেলো নিচের দিকে তাকাবার। তাকিয়ে দেখলো, নিচে কতগুলি খুদে-খুদে কালো মাথা ফুটকির মতো দেখাচ্ছে—তিড়িং-বিড়িং ক'রে লাফাচ্ছে তারা—বেলুনকে এত উপরে উঠতে দেখে তাদের ফূর্তি ছাখে কে!

সূর্য তখন অনেকখানি উঠে এসেছে আকাশে—আলোর আভা ছিটিয়ে দিচ্ছে সবখানে: গাছের ডালে, ঘড়িঘরের মাথায়, বেলুনের গায়ে, নিচের মাঠে রাস্তায় বাড়িঘরের ছাতে; আর আসছে হাওয়া— দূরের থেকে ব'য়ে নিয়ে আসছে গন্ধ আর ফুলের রেণু। বেলুন এখন কী করবে ঠিক বুঝতে পারলে না—নিচে নামলেই তো ছেলেগুলো তাকে নিয়ে নানারকম গণ্ডগোল শুরু ক'রে দেবে—যা একটা চোখা কঞ্চি ছিলো একটি ছেলের হাতে, একবার বিঁধিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে দিলেই তো সব শেষ—ইহকালের লীলাখেলা একেবারে সাঙ্গ।

ঠিক এমন সময়ে তীক্ষ্ণ একটি পাখির ডাকে তার ভয়-ভাবনা চিরে-চিরে গেলো। কেঁপে উঠে ভয়ে-ভয়ে সে তাকিয়ে দেখলো তার মাথার উপরে ঘুরে-ঘুরে পাক খাচ্ছে মস্ত এক ডানা-মেলা চিল— বাদামি ডানায় সূর্যের আলো প'ড়ে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে সোনালি আভা; আর তার ডানার ছায়া ঠাণ্ডা কতগুলি শিহরণের মতো তার গায়ে কালো স্পর্শ বুলিয়ে যাচ্ছে। একটানা এক তীক্ষ্ণ ডাকে আকাশ ফেঁড়ে দিয়ে সে ঘুরে-ঘুরে নামতে শুরু ক'রে দিলো, বাঁকা চোখা কালো ঠোঁটটা তার বাড়ানো থাকলো নিচের দিকে, সরু দুটো ঠ্যাং যেখানে

শেষ হয়েছে সেখানে কালো বাঁকা নখগুলো আঙুলগুলি যেন উৎসুক হ'য়ে আছে ছোঁ মেরে তাকে নিয়ে যাবে ব'লে।

ভয়ে বেলুন যেন একেবারে নেতিয়ে গেলো। চিলের ডাক আর ঘড়িঘরের মিনিটের কাঁটার একঘেয়ে শব্দ—এই দুটিতে মিলে যেন তাকে একেবারে হতচেতন ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। যেন এক ঝিমধরা মচ্ছার ভিতর সে তলিয়ে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে। এখন যে তার তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যাওয়া উচিত, এই ছোট্ট কথাটুকুও যেন কিছুতেই তার বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না।

ঠিক এমন সময়ে—বরাং ভালো বলতে হবে—রঙ্গন দৈবাং বেলুনটিকে দেখতে পেলো আকাশে। দেখেই সে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে তাকে ডাক দিলে! ঝাপশাভাবে কেঁপে-কেঁপে হাওয়া ভাসিয়ে নিয়ে গেলো তার ডাক, সোজা পৌঁছে দিলো বেলুনের কাছে। রঙ্গনের গলা না? যেই এ-কথা ভাবলে, অমনি তার সব ভয় দূর হ'য়ে গেলো পলকে। শোঁ ক'রে নেমে এলো সে নিচের দিকে—কিন্তু খানিকটা দূর গিয়েই হঠাৎ প্রচণ্ড এক হ্যাচকা টানে আটকে গেলো। রঙ্গন দেখলে, কারা যেন মোটা সুতোয় বেঁধে গায়ের জোরে ওকে টানছে—কিছুতেই এ-দিকে আসতে দিচ্ছে না। আবার সে ডাকলো বেলুনকে, যদি কোনো রকমে সে তাকে একবার হাতের নাগালে পায়, তাহ'লে চট ক'রে সুতোটা ছিঁড়ে দিতে পারে।

সোনালি সেই চিলটা যেই দেখলে তার টুকটুকে শিকার হাতছাড়া হ'য়ে গেলো, অমনি চাকার মতো ঘুরে-ঘুরে জোরে নেমে আসতে লাগলো নিচের দিকে। প্রায় তার নখ বেলুনকে ছোঁয় আর কি, এমন সময়ে একটি ছেলে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, 'এই রে, সর্বনাশ! দিলে বুঝি চিলটা বেলুনকে ফুটো ক'রে। এই জন্যেই বেলুনটা পালাতে

চাচ্ছিলো ও-দিকে! দে, দে, শিগগির লাটাইয়ের সুতো ঢিলে ক'রে দে!'

সুতোর টান হঠাৎ ক'মে যেতেই বেলুন যেন ছিটকে অন্য দিকে চ'লে গেলো, আর ঠিক তার পাশ দিয়েই শোঁ ক'রে উড়ে চ'লে গেলো চিলটা। আর দেরি নয়, তক্ষুনি বেলুন উড়ে এলো রঙ্গনের কাছে। ভয়ে সে যেন চুপসে যেতে বসেছে, ঘাম ঝরছে টপ-টপ ক'রে—এত সে ঘাবড়ে গিয়েছে এই সব দেখে-শুনে! রঙ্গনও আর-এক মুহূর্তও দেরি করলো না, তাড়াতাড়ি খুলে ফেললো সেই মোটা সুতোটা, তারপর বেলুনকে নিয়ে প্রাণপণে ছুটতে শুরু ক'রে দিলে শহরের সেই বাঁকা রাস্তা ধ'রে।

বেলুন চ'লে যেতেই চিলটা আবার ঘুরে-ঘুরে উপরে উঠে গেলো, শুধু যাবার আগে কয়েকটা সোনালি পালক ঝ'রে পড়লো তার—আর ছেলেরা চটপট সেগুলি কুড়িয়ে নিলে। তখনও তারা ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি, কী হ'লো। যে-ছেলেটির হাতে লাটাই ছিলো, সে দেখলে হঠাৎ সব সুতো হাওয়ায় ভেসে নিচের দিকে প'ড়ে যাচ্ছে কেঁপে-কেঁপে। দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই রে, সেরেছে! নির্ঘাৎ পালিয়েছে বেলুনটা। দেখলি, কী রকম ভেলকি দেখালে আমাদের—ঠিক যেন ভানুমতীর ভোজবাজি—কিছুই কিনা প্রথমটায় বুঝতে পারি নি।'

তারাও আর দেরি করলো না; সবাই মিলে হৈ-হৈ ক'রে ছোটো-ছোটো দলে ভাগ হ'য়ে বেরিয়ে পড়লো অভিযানে। আর যেই দূরে দেখলে রঙ্গনকে, বেলুনের সুতো শক্ত ক'রে মুঠোয় ধ'রে ছুটে পালাচ্ছে, অমনি ফুর্তিতে তারা আটখানা হ'য়ে গেলো। বেশ জমবে আজকের অভিযান—ভীষণভাবে সবাই তাড়া ক'রে এলো ওদের। গোটা পাড়াটাই ভ'রে গেলো তাদের চ্যাঁচামেচিতে, যেন বেলুনটার মালিক

আসলে হ'লো তারাই, শুধু রঙ্গন সেটাকে চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছে।

ভয় পেলে ছোট্ট কান-খাড়া ধবধবে খরগোশ যেমনভাবে ছোটে, ঠিক তেমনিভাবে ছুটতে লাগলো রঙ্গন প্রাণপণে। প্রথমটায় সে মনে-মনে ভেবেছিলো, কোনো রকমে যদি রাস্তার লোকের ভিড়ের মধ্যে সে লুকিয়ে পড়তে পারে, তাহ'লে এই বোম্বেটেমার্কা জাঁহাবাজগুলো তাকে আর খুঁজে বের করতে পারবে না। কিন্তু এত সুন্দর একটা জ্বলজ্বলে লাল বেলুনকে লুকোনো যায় কী ক'রে—তাকে তো অনেক দূর থেকে দেখেই সবাই ঠিক চিনে ফেলবে।

তাই ছেলেগুলোর হাত এড়িয়ে পালাবার জন্যে বড়ো রাস্তা ছেড়ে রঙ্গন ঢুকলো আঁকাবাঁকা ছোট্ট এক দমবন্ধ গলির ভিতর, যেখানে এমনকি সূর্যের আলো আর বসন্তের হাওয়া পর্যন্ত ঢুকতে ভয় পায়।

১০

কালো এক গলি, দিনের বেলাতেও অন্ধকারে ঝাপশা।

এঁকে-বেঁকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে এগিয়ে গেছে সামনে, যেন মস্ত এক সাপের খোলশ প'ড়ে আছে নির্জীব। নোংরা রাস্তা, আবর্জনা আর জঞ্জালে ভরপুর, থোকা-থোকা দুর্গন্ধ যেন ঘুরে-ঘুরে উঠে আসছে সেই ছাইপাঁশ কত-কী থেকে। প্রথমটায় রঙ্গনের দমবন্ধ হ'য়ে যেতে চাইলো, কিন্তু তবু সে একবারও না-থেমে কেবলি ছুটে চললো সামনের দিকে, আর তার ছোট্ট হাতের মুঠোয় আঁটো ক'রে ধরা থাকলো বেলুনের স্থতো। একটু পরেই তার মুঠোর ভিতরটা ঘেমে গেলো, ভিজে গেলো সেই স্থতো--আর এটাই বোধ করি তার প্রমাণ যে সে তখন কতটা মরীয়ার মতো ছুটছিলো।

ছেলেরা কিন্তু তবুও রঙ্গনের পিছন ছাড়লো না। প্রথমটায় একটা চৌরাস্তার সামনে এসে বেশ খানিকটে বেকায়দায় পড়েছিলো তারা—রঙ্গন যে কোন দিকে গেছে কিছুতেই তা ভালো ক'রে বুঝে উঠতে পারছিলো না। কিন্তু বেশিক্ষণ আর সময় নষ্ট করলো না তারা, তক্ষুনি কয়েকটা ছোটো-ছোটো দলে ভাগ হ'য়ে গেলো, তারপর সবগুলো রাস্তা ধ'রেই ছুটে চললো তাদের উত্তেজিত গেরিলা বাহিনী। ভীষণ খুশি তারা এই ছুটোছুটির দরুণ, বেশ ভালোই লাগছে ভিতরে-ভিতরে; অনেক দিন পরে সময় কাটাবার একটা উপকরণ পাওয়া গেলো। রঙ্গনের

বাড়ি তো তারা চেনেই ; কোথায় যাবে রঙ্গন তাদের হাত এড়িয়ে ? ধরা সে পড়বেই, আর তারা অনায়াসেই তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে বেলুন, কিছুই করতে পারবে না সে তাদের। সে তো একা, আর তারা এতজন—অনেক বেশি তারা সংখ্যায়—একা একটি ছোট্ট রোগা মিরকুটে ছেলে কী করতে পারবে তাদের ?

পিছনে কিছুক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ না-পেয়ে রঙ্গন ভেবেছিলো শেষ অবধি তাহ'লে খুব এড়ানো গেছে এই পাড়া-কাঁপানো ছেলেদের হাত। ছুটোছুটি ক'রে ভীষণ হয়রান হ'য়ে গেছে সে তখন, বড্ড ক্লান্ত লাগছে নিজেকে ; এত ক্লান্ত যে, হাঁটুর জোড়গুলো যেন খুলে যাবে আরেকটু ছুটলেই ; হাঁপাচ্ছে সে ভয়ানকভাবে। এত জোরে কখনো সে ছোটেনি এর আগে, কিন্তু বেলুনকে তো ওই হার্মাদগুলোর হাত থেকে বাঁচাতে হবে। একটু জিরিয়ে নিতে পারলে হ'তো। এমন একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু দম নিতে হবে, যে-জায়গাটা ওরা কিছুতেই খুঁজে বের করতে পারবে না। কিন্তু আশপাশে দেখে-শুনে বুঝলো আরো খানিকটা এগিয়ে না-গেলে সে-রকম কোনো জায়গায় পৌঁছনো যাবে না।

আঁকাবাঁকা সেই কালো গলিটা খানিক বেঁকে, খানিক টেরচাভাবে গিয়ে, একটুখানি সরল রেখার ভঙ্গিতে এগিয়ে শেষকালে এসে পড়লো একটি মোড়ের কাছে, যেখানে তিনমুখো তিন রাস্তা গেছে : আর তিনটি রাস্তাই বেশ বড়ো, রোদে ঝলমল করছে, উপচে পড়ছে যেন আলোর পেয়ালা। আর এখানে আসতেই বাঁকাভাবে একটি বাড়ির কার্নিশের পাশ দিয়ে কতগুলি রুপোর রশ্মি এসে পড়লো বেলুনের গায়ে, আর বেলুনের যে-দিকটায় আলো পড়লো সে-জায়গাটা হঠাৎ যেন কোনো ভোজবাজির মতো ঝলমল ক'রে উঠলো। এতক্ষণ সেই কালো গলিতে বেলুনকে দেখাচ্ছিলো সেই রঙের, রক্ত জমাট বেঁধে গেলে যে-রকম

কালচে ছিট লাগে লালের গায়ে। এখন তা এমনভাবে ঝলমল ক'রে উঠলো, যেন কোনো কাঁটাগাছে ঝিরি-ঝিরি পাপড়ি কাঁপিয়ে দিলো কোনো লাল গোলাপ, যেন কেঁপে-কেঁপে বেজে উঠলো একটি রক্তভরা হৃৎপিণ্ড, আর মুহূর্তে যেন একটি তীব্র হাতুড়ির আঘাতে ধ্বক ক'রে লাফিয়ে উঠলো রঙ্গনের ভিতরটা, ঠিক যেন কেউ প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টানে তাকে জোর ক'রে থামিয়ে দিলে, কানে-কানে কোনো আশ্চর্য ভাষায় এই আদেশ দিলে, 'ছাখো,' আর সে যেন হঠাৎ লক্ষ করলো কোনো-এক মস্ত অদৃশ্য হাত একটানে হঠাৎ সব পর্দা তুলে দিলে। যেন তক্ষুনি তার সামনে খুলে বেরিয়ে গেলো এতকালের অগোচর কোনো-এক অলীক জগৎ, আর মুহূর্তে তা যেন তাকে জয় ক'রে নিলে।

রঙ্গনের মনে হ'লো যেন কোনো গোপন সিন্দুকের চাবি ঘুরে গেলো, এমনিভাবে অদৃশ্য এক তলোয়ার লাফিয়ে উঠে চিরে দিলে বেলুনের পাৎলা-লাল শরীরটা, আর অমনি খুলে গেলো লুকোনো এক দেরাজ : নিজের ব'লে যা-কিছু তার এতকাল চাপা ছিলো আড়ালে, সব যেন প্রকাশ ক'রে দিয়ে নতুন আর এক ঝাপশা রহস্য দিয়ে ভ'রে দিলে সব। অলৌকিক সব রাজপুরী আর নগরীর স্মৃতি, গ্রাম, রাস্তা, ঘরবাড়ি, সব—সব যেন শ্রাবণমাসের অফুরান বাদলের মতো, দ্রৌপদীর শাড়ির মতো, ভাঁজের পর ভাঁজ খুলে বেরিয়ে এলো ; লাটাই থেকে ফিতে যেমন ক'রে ঘুরে-ঘুরে বেরিয়ে আসে দ্রুত, তেমনি এলো তারা দলে-দলে, এলোমেলো। দেখলো সে এক বিকেলবেলার রাজবাড়ি, যারা অলিন্দে রূপকথার মেয়েরা আলতো হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে ওড়না, আর লাজুক হেসে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে হাত, আমন্ত্রণের স্বরে বেজে উঠেছে তাদের গলা।

সব যে স্পষ্ট চোখে দেখলো, তা নয়। যেন কোনো জলের তলা থেকে

উঠে এসে তারা পৌঁছতে চাইলো তার কাছে—বুঝি এক্ষুনি সম্পূর্ণভাবে ধরা দেবে তার কাছে। গা দিয়ে তাদের জল ঝরছে, সারা গায়ে ছড়িয়ে আছে সবুজ শ্যাওলা আর জলের ফুল, মাথার চুলে বুঝি জড়িয়ে আছে ঝিনুক আর কড়ি আর শাদা শাঁখ: তারা বুঝি উঠে এলো অনেক গভীর থেকে—রূপসী সব জলের মেয়ে,—আলো প'ড়ে চকচক ক'রে উঠলো তাদের কোমল রুপোলি ল্যাজ, আর তার পরের মুহূর্তেই আবার তারা ডুব দিলো গভীরতায়, আবার তারা হারিয়ে গেলো হঠাৎ কোনো খেয়ালি কালো জলের প্রবল ঢেউয়ে।

আর তারপরেই আচমকা আরেক প্রবল টানে সব স্বপ্ন ছিঁড়ে গেলো তার।

তুমুল গলার চ্যাঁচামেচি শুনে চমকে উঠে সে সামনে তাকিয়ে দেখলো তার দিকে ছুটে আসছে একদল ছেলে, আর ফুর্তিতে তারা জ্বলজ্বল ক'রে উঠেছে, চ্যাঁচাচ্ছে জোর গলায়। চমকানোর ভাবটা কাটিয়ে উঠেই সে পিছন ফিরলো, কিন্তু কোথায় পালাবে রঙ্গন? পিছন থেকেও আরেকটা দল ছুটে আসছে তাকে পাকড়াও করবার জন্যে। বিপদ দেখে বাঁকা বিদ্যুতের মতো শাঁৎ ক'রে রঙ্গন ছুটলো এক টুকরো পোড়ো জমির দিকে। নেকড়ের তাড়া খেয়ে কালো বনের বাচ্চা হরিণ যেমন ক'রে ছোটে, তেমনি সে ছুটে গেলো, আর ভাবলো ওই পোড়ো জমির উপর দিয়ে ও-পাশের ওই বাড়ির উঠোন দিয়ে ছুটে গিয়ে অন্যধারের রাস্তায় পড়লে আর-কোনো বিপদ থাকবে না তার আর বেলুনের। মস্ত এক বাড়ি উঠছে সেই পোড়ো জমিটায়, লোহার কাঠামোর চারপাশ ঘিরে ইট-কাঠের দাঁত-বের-করা লাল দেয়াল উঠে গেছে উপর দিকে, আর তার চারপাশে বাঁশের সিঁড়ি লাগিয়ে রাখা; ওই সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়েই মিস্তিরিরা কাজ-কর্ম করে। আর ওই আধাআধি বানানো

বাড়িটার পাশেই উঠেছে বিরাট এক মহানিমগাছ। মস্ত সেই মহীরুহ দিগন্তের দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে তার জটিল আঁকাবাঁকা ডালপালা; এমন সময় হঠাৎ যেন হাওয়া এলো দূরের থেকে, আর হাওয়ায় কেঁপে উঠলো তার সবগুলি পাতা, ঝিরি-ঝিরি, এলোমেলো; আর এক স্নিগ্ধ পরিমল ছড়িয়ে দিলো পবনে!

বাড়ি বানাবার চুন বালি শুর্কির স্তূপই বাধা দিলো রঙ্গনকে—

তাড়াতাড়ি আর ছুটতে পারলো না সে ; শুধু তাকিয়ে দেখলো বৃষ্টিধারার মতো চারদিক থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে ছেলেরা এসে তাকে ঘিরে ধরলো।

আর তার কিছুই করার নেই। সব চেষ্টা তার ব্যর্থ হ'লো, যেন শেষ খড়কুটোও ভার সইতে না-পেরে তলিয়ে গেলো অকূল জলে। চট ক'রে রঙ্গন ছেড়ে দিলে বেলুনকে, ফিশফিশ ক'রে বললে, 'বেলুন, শিগগির তুমি বাড়ি চ'লে যাও—অনেক উঁচু দিয়ে চ'লে যাও—সাবধান! ওরা কেউ যেন কিছুতেই তোমাকে ছুঁতে না-পারে।'

তক্ষুনি একটা ডিগবাজি খেয়ে সোজা উপরে উঠে গেলো বেলুন—সকলের নাগালের বাইরে, অনেক দূরে।

এবারে কিন্তু বেলুনটাকে পাকড়াও করবার কোনো চেষ্টা না-ক'রে ছেলেরা সবাই আক্রমণ করলে রঙ্গনকেই। সর্দারটি এসে শক্ত হাতে চেপে ধরলো তার রোগা কব্জি, তারপর বুকের জামা টেনে ধ'রে প্রথমে ভীষণ-এক ঝাঁকুনি দিলে।

মুখ-চোখ শুকিয়ে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে রঙ্গনের—একেবারে কাগজের মতো শাদা। লাল হ'য়ে উঠেছে কানের ডগা, নিশ্বেস পড়ছে জোরে, আর কপালের কাছে উঁচুভাবে ফুলে উঠেছে দপদপে একটি নীল শিরা—রক্ত যে তার ভিতরে ফেনিয়ে ঘুরছে, তারই যেন তীব্র এক নজির। বাকি সব ছেলেরা ঘিরে দাঁড়ালো তাকে, তারপর আরম্ভ হ'লো ফিকফিক হাসি, হট্টগোল, ছিবলেমি আর নানারকম কদাকার মন্তব্য ও ঠাট্টা।

বেলুন একটু দূরে চ'লে গিয়েছিলো ; ভেবেছিলো সে চ'লে গেলেই আর বুঝি কোনো বিপদ থাকবে না রঙ্গনের। কিন্তু এই প্রচণ্ড গণ্ডগোল শুনে ভয়ে আঁৎকে উঠে সে পিছন ঝুঁকে, সার্কাসের

খেলোয়াড়ের মতো মাথা তলার দিকে এনে, পিছন ফিরলো, আর অমনি দেখতে পেলো রঙ্গনের দুর্দশা। আর একটুও দেরি করলে না সে, তৎক্ষণাৎ নামতে শুরু করলে নিচের দিকে। এই ভয়ানক হার্মাদ-গুলোর হাতে রঙ্গনকে ফেলে রেখে একা সে কী ক'রে যায় নিশ্চিন্তভাবে। নামতে তাকে হবেই ; ছেলেগুলো হয়তো তাকে ফাটিয়ে দেবে, মেরে ফেলবে তাকে, ফুটো ক'রে ফেলবে তার পাৎলা শরীর, মস্ত চ্যাঁদা বানিয়ে গলগল ক'রে বের ক'রে দেবে ভিতরের সব হাওয়া, কিন্তু তবু যদি রঙ্গনকে তারা ছেড়ে দেয়, তাহ'লে সেই ফেটে-যাওয়াটাও সহ্য করবে সে হাসিমুখে।

বেলুনকে ঘুরে-ঘুরে নেমে আসতে দেখে ছেলেদের হট্টগোল আরো বিকট হ'য়ে পড়লো। একের পর এক বড়ো-বড়ো ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে তারা বলাবলি করলে, 'দেখি, কার টিপ কী-রকম? বেলুনকে ঢিল মেরে যে ফাটিয়ে দিতে পারবে, বোঝা যাবে তারই কেরামতি সবচেয়ে বেশি।' একের পর এক ঢিলগুলি ছুটে এলো বেলুনের দিকে, সে-সব ঢিলের একটাই যথেষ্ট বেলুনকে ফাটিয়ে দেবার জন্য। বন্দুকের শিস-তোলা ঝলশানির মতো তার পাশ দিয়ে ঢিলগুলো একের পর এক চ'লে গেলো শূন্যের দিকে।

'ছুটে চ'লে যাও বেলুন, শিগগির চ'লে যাও, নইলে ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে!' গলা শুকিয়ে গেছে রঙ্গনের, বুকের ভিতরটা টিপ-টিপ ক'রে বেজে উঠছে, এত তার ভয় যে তার চোখের তারা দুটি যেন উল্টে বেরিয়ে পড়বে। আকুল হ'য়ে সে বারে-বারে চ'লে যেতে বললো বেলুনকে, 'আমার জন্যে তুমি ভেবো না—তুমি তো আগে নিজে নিরাপদ জায়গায় চ'লে যাও!'

কিন্তু বেলুন তখন মন স্থির ক'রে ফেলেছে। এই সে শেষবারের

মতো অমান্য করবে রঙ্গনের কথা ; আজকের এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার পর যা-যা বলবে রঙ্গন, সব সে শুনবে, কিন্তু এখন কিছুতেই সে রঙ্গনকে ছেড়ে চ'লে যেতে পারবে না। সে কি এতটাই ভিতু যে প্রাণের ভয়ে তার বন্ধুকে ফেলে চ'লে যাবে ? ছেলেদের সঙ্গে লড়াই করতে-করতে নানা জায়গায় ছিঁড়ে গেছে রঙ্গনের পোশাক, কেটে-চিরে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছে তার শরীরের নানা জায়গা, আর ওই যে ফোঁটায়-ফোঁটায় রক্ত ঝরছে রঙ্গনের শরীর থেকে, তার প্রত্যেকটি বিন্দুই তো সে যে কত ভালোবাসে বেলুনকে তারই প্রমাণ। আর এত ভালোবাসা পেয়েও সে তার ভালোবাসার জনকে ফেলে চ'লে যাবে ? না, তা কিছুতেই হ'তে পারে না। বেলুনের ভিতরকার সব হাওয়া যেন ঠাণ্ডায় জ'মে মেঘ হ'য়ে গেলো, তারপরেই যেন শুরু

হ'য়ে গেলো অঝোর এক বর্ষার দিন। টপটপ ক'রে জল পড়তে লাগলো বেলুনের চোখ থেকে, আর সে যেন বলতে চাইলো, 'কেন তুমি এমন কথা বলছো, রঙ্গন ? কিছুতেই আমি ছেড়ে যাবো না তোমাকে। এত ভালোবাসো তুমি আমাকে! আর আমি কিনা কোনো কথাই শুনিনি তোমার ? এই শেষবার আমাকে অবাধ্য হ'তে দাও, রঙ্গন,—তোমার দুটি পায়ে পড়ি,—এই শেষবারের মতো তুমি আমাকে আমার নিজের ধরণেই ভালোবাসতে দাও।' টপটপ ক'রে জলের ফোঁটা পড়ছে, আর বেলুন ঘুরে-ঘুরে নেমে আসছে—ঠিক এমন সময়ে মস্ত একটা ঢিল গিয়ে লাগলো বেলুনের গায়ে। আর একদলা কান্নার মতো ঝাপশা অস্ফুট একটি আওয়াজ ক'রে ফেটে গেলো বেলুন—মস্ত এক ফুটো হ'য়ে গেলো তার লাল শরীরে, ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো গন্ধ-ভরা এক ঝলক করুণ হাওয়া, আর রঙ্গন সেই গন্ধের বন্যায় ডুবে গেলো যেন—যেন এক্ষুনি তার দম বন্ধ হ'য়ে যাবে।

মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে আকুল হ'য়ে সে কাঁদতে লাগলো তার বন্ধুর শোকে।

১১

আর তক্ষুনি ঘটলো সবচেয়ে আশ্চর্য এক ঘটনা।

সেই মস্ত মহানিমটির ডালেপালায় সেই গন্ধ গিয়ে যেন ফিশফিশ ক'রে কী ব'লে দিলে, আর সবুজ সেই কচি পাতাগুলি মুহূর্তে বাদামি হ'য়ে গেলো, তারপরেই হলুদ : স্পষ্ট দেখা গেলো পাতার ভিতরকার সুতোর মতো সরু শিরাগুলি, আর খশখশে একটা শিহরণ তুলে ঘুরে-ঘুরে ঝ'রে প'ড়তে থাকলো তারা এক-এক ক'রে। আর মাটিতে প'ড়েই একেকটা পাতা একেকটা মস্ত গ্যাস-বেলুন হ'য়ে গেলো, কেউ লাল, কেউ বেগনি, কেউ হলদে, কেউ নীল—আর কোনো-কোনোটি বা রঙিন প্রজাপতিদের মতো নানা রঙের ছুপিয়ে আনা। আর এলো চারদিক থেকে পৃথিবীর সব বেলুন—শূন্যে আকাশে লম্বা সরলরেখার মতো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলো তারা কাতারে-কাতারে, ঠিক যেন কোনো সেনাবাহিনীর সেপাই। টান হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা, যেন তৈরি হ'য়ে আছে শেষ নির্দেশের জন্যে।

আসলে এটা হ'লো বেলুনদের বিদ্রোহ। অনেক, অনেকদিন পরে যখন ইতিহাসের লেখকরা এই ঘটনার কথা তাঁদের মোটা-মোটা পুঁথিতে লিখেছিলেন, তখন একে বলেছিলেন 'বেলুনদের মহাবিদ্রোহ'। তাঁদের বর্ণনা থেকেই জানা যায় যে সব বেলুনগুলো সার বেঁধে নেমে এসেছিলো রঙ্গনের কাছে, তারপর অনেকক্ষণ ধ'রে তারা নাচগান করেছিলো তার

চারপাশ ঘিরে-ঘিরে, আর তাদের সুতো দিয়ে আঁটো ক'রে জড়িয়ে নিয়েছিলো তার শরীর, তারপর তাকে নিয়েই তারা উঠে গিয়েছিলো আকাশে, দিগন্ত পেরিয়ে এমন এক ভুবনে তাকে নিয়ে গিয়েছিলো, যেখানে—

যেখানে কিছুই সেই রকম নয়, যা ভালোবাসা আর ইচ্ছে আর প্রাণের বিরোধী।

কিন্তু সে হ'লো আরেক দেশের কথা, সব পেয়েছির দেশ যার নাম।

ল্যাম্পপোস্টের বেলুন

রচনাকাল

শ্রাবণ, ১৩৬৫

কলকাতা